সমুদ্রের চোখ

সমরজিৎ কর

সমুদ্রের চোখ

সমরজিৎ কর

বর্ণালী | ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
কান্তিরঞ্জন ঘোষ
কাঁচড়াপাড়া

মুদ্রাকর :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—বারো টাকা

অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী
শ্রদ্ধাভাজনেষু.

সমরজিৎ কর

এই লেখকের ঃ

জন্ম কল্প

একটি সংকেতের জন্যে

পৃথিবী থেকে চাঁদে

এক কৌটা বিষ

ভয়ঙ্কর সেই মানুষটি

আবিষ্কারের অভিযানে

এ যেন সত্যিই এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

দীর্ঘ দশ বছর মৃত্যুকে একটানা সামনে দাঁড় করিয়ে একটা মানুষ কী ভাবে মাথা ঠাণ্ডা রেখে এমন একটি দুর্ধর্ষ রকমের কাজ করে যেতে পারেন, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। হ্যাঁ, দীর্ঘ এই দশ বছর তাঁর মাথার ওপর দাঁড়িয়েছিল আস্ত একটি সমুদ্র। আর তার নীচে কবরস্থ হয়ে প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কাজে লাগিয়েছেন পৃথিবীর সারা মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে। পাগল ছাড়া কি বলব, বলুন? কারণ প্রত্যক্ষ না করলে তাঁর সব কিছুই যেন উদ্ভট বলে মনে হয়।

উদ্ভট। পুরোপুরি উদ্ভট। উর্বর মস্তিষ্কের অতি কল্পনাই হয়ত।

নিকোবর দীপপুঞ্জের আরও দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের সেই বিস্তৃত অঞ্চলটি নিয়ে কাউকে কোন দিন এমন ভাবে যে মাথা ঘামাতে হবে, কে ভেবেছিল, বলুন?

গ্রেট নিকোবরের দক্ষিণে বোলানগা বন্দর। এই বন্দরের দক্ষিণে প্রায় দুশ' মাইল জুড়ে শত শত দ্বীপের দিকে চাইলে মনে হয়, তারা এক একটি যেন আস্ত প্রহরী। ছোট ছোট দ্বীপ। কোনটি ন্যাড়া। কারোর বুকে ছোট খাটো ঝোপ ঝাড়। অথবা যৎসামান্য গাছপালা। কোন দ্বীপ ভাঁটার সময় সমুদ্রের বুকে ভেসে ওঠে। আবার জোয়ারের টানে জলের নীচে তলিয়ে যায়।

এ সব দ্বীপের আনাচে কানাচেও মৃত্যুর হাতছানি। এখানকার ডুবন্ত পাহাড় নাবিকদের কাছে যেন আস্ত এক একটি বিভীষিকা।

তবু এই অঞ্চলটিকে ঘিরেই শেষ পর্যন্ত রূপকথার মত গল্প ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

হ্যাঁ। দশ বছর। একটানা দশ বছর।

গল্পগুলি পৌঁছে দিচ্ছিল কিছু কিছু দুঃসাহসী জেলে। প্রথমে

বোলানগায়। বোলানগা থেকে সেই গল্প আবার বেলুনের মত ফেঁপে ফুলে ছড়িয়ে পড়েছিল সারা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে, আন্দামানে, কখনও বা ভারতীয় ভূখণ্ডেও।

এই সব জেলেদের বেশিরভাগ পেশায় সামুদ্রিক রত্নের সংগ্রহকারী। নিজেদের ছোট ছোট মোটর বোটে চেপে ঈগলের চোখ নিয়ে ভারত মহাসাগরের এই এলাকাটা জুড়ে হন্যে হয়ে তারা ঘুরে বেড়াত। মুক্তো সংগ্রহের তাগিদে। এদের কাছে সমুদ্রই ঘর বাড়ি। সমুদ্রই জীবিকা। বেপরোয়া এই জেলেদের কাছে সমুদ্র যেন শিশুর মত আদরের সামগ্রী।

গল্পগুলি একে একে এদের কাছ থেকেই আসতে শুরু করল।

প্রথম গল্পটি শোনাল দক্ষিণ ভারতীয় এক নাবিক। বছর পঞ্চাশ বয়সের এই নাবিকটি বোলানগা বন্দরের একটি ছোট্ট সরাই-এ বসে বেশ উত্তেজিত ভাবে তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে যাচ্ছিল।

তখন সবে সন্ধ্যে শুরু হয়েছে। জুন মাসের শেষ সারাদিন ভ্যাপসা গরমে পচে বন্দরের কিছু শ্রমিক এবং মাল্লা সরাই-এ এসে যখন পান ভোজনের মাধ্যমে আসর বেশ জম জমাট করে তোলার চেষ্টা করছিল, দক্ষিণ ভারতীয় সেই জেলেটির আবির্ভাব ঘটল ঠিক তখনই।

লোকটির নাম ডেভিড। তিন পুরুষ আগে ওদের পরিবার বাস করত ভিশাগাপট্টমের কাছে একটি গ্রামে। বঙ্গোপসাগরের বুকে ডিঙ্গি নাচিয়ে মাছ ধরা ছিল ওদের পেশা। এক সময় গ্রামে মড়ক দেখা দিল। মড়কের হাত থেকে গ্রামটিকে রক্ষা করার জন্যে এলেন একদল ক্রিশ্চান মিশনারি। ডেভিডের ঠাকুর্দার সজ্জন বলে খ্যাতি ছিল গ্রামে। ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের সঙ্গে তিনিও সেবার কাজে লেগে যান। পরে তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে দীক্ষা নেন।

ব্যাপারটা ঘটেছিল খুবই তড়িঘড়ি ভাবে। সম্ভবত তাৎক্ষণিক আবেগ বশতঃ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাচারা বিপদে পড়লেন। সমাজের চাপে তাঁকে সপরিবারে গ্রাম ছাড়তে হল। এমন বিপদের মুখে ওই

মিশনারিরাই সাহায্য করেছিলেন তাঁদের। তাঁদের চেষ্টায় কালাপানি পেরিয়ে ডেভিডের ঠাকুর্দা চলে আসেন পোর্ট ব্লেয়ারে। এখানে এসে ওই মাছ ধরার পেশাই শুরু করেছিলেন তিনি। পরে তাঁর মৃত্যুর পর ডেভিডের বাবা সপরিবারে ঘর বাঁধেন নিকোবরে বোলানগায়। মাছ ধরা ছেড়ে তাঁর সময় থেকেই শুরু হয় সমুদ্রে মুক্তো সংগ্রহের কাজ। সে কাজ এখন চালিয়ে যাচ্ছে ডেভিড।

বেপরোয়া নাবিক হিসেবে ডেভিডের নাম ডাক খুব। সব রকম বিপদ এবং ঝক্কি মাথায় নিয়ে চলার ক্ষমতাও সে রাখে এবং তার সব চাইতে বড় গুণ, মানুষকে আমাদের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার ক্ষমতা তার অপরিসীম। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে সে চলে যায় সমুদ্রে। তারপর হঠাৎ হুট করে বাড়ি ফিরে চলে আসে সহরের এই সরাই-খানায়। তখন শুরু হয় পানীয় সহযোগে আমোদের ফোয়ারা। ডেভিডকে পেয়ে সরাইখানা সত্যিই যেন ফোয়ারা হয়ে উঠল।

—আরে এই যে! আমাদের ডেভিড দাদা এসে গেছে। ডেভিডকে দেখে যেন লাফিয়ে উঠল সবাই একসঙ্গে।

বুড়োমাঝি আন্নামালাই তো ছুটে এসে আদর করতে গিয়ে এক মুখ চুমুই খেয়ে বসল।

সে বলল, ব্যাপার কি ডেভিড? এবার যেন দরিয়ার জলে ডুব মেরেছিলে তুমি? দেখা সাক্ষাৎ নেই এতদিন কেন?

ডকের পাইলট লঞ্চের সারেং মহিম মিঞা বলল, ⸗ লা এবার কামাইছে খুব। বলি, বেবাক শুক্তি এবার উজাড় করে আনলে, তাই না?

প্রথম দর্শনের উত্তেজনা শেষ হতে না হতেই যেন বোমা ছুঁড়ে বসল ডেভিড।

বলল, দাঁড়াও চাচা। এবার এক দারুণ কাণ্ড। বাপের জন্মে এমন তোমরা কেউ দেখনি।

ডেভিডের কথায় সারা সরাইখানা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

কি ব্যাপার, বল দেখিনি ? প্রশ্ন করল মহিম।

দাঁড়াও চাচা, আমাকে আগে সামলাতে দাও। ব্যাপারটা আর একবার ভাল করে বুঝে নিই আমি।

কথা বলেই গম্ভীর হলো ডেভিড।

আর সবাই অদ্ভুত এক নীরবতা নিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল।

ডেভিড বলল, চাচা, পাইলট জাহাজ নিয়ে তুমি তো দরিয়ার তামাম জায়গা টহল দিয়ে মারো। কিন্তু এবার যা আমি দেখে এলাম, বাপের জন্মে এমন জিনিষ কেউ তোমরা দেখনি।

সবাই এবার আরও উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

ডেভিড বলল, এখান থেকে, তা শত খানিক মাইল হবে। বলব কি চাচা, একেবারে দিনের বেলা তখন। বলতে পারবে না, তখন আমি নেশা ভাঙ করে পড়ে রয়েছি। কি দেখলাম জানো ? ডুবুরীর পোশাক পরে সবে জলের মধ্যে নেমেছি। নামছি, আরও নামছি। এমন সময়—সে কি বাহার। বহুদূরে সাগরের নীচে মনে হল বড় দিনের মোচ্ছব চলেছে। লাল নীল আর সাদা আলোর রোশনাই। আর তার ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে বেড়াচ্ছে আজব সব প্রাণী। কালো কালো মুখোশ পরে। না। বেশিক্ষণ না। মিনিট খানিক হবে। তারপর—ও মা ! কোথায় রোশনাই। সব আলো নিভে গিয়ে যেন দরিয়ার সমস্ত জল যেন পিচ ঢালা অন্ধকারে ডুবে গেল।

কি বলছিস তুই, ডেভিড ? যেন আঁতকে উঠল বুড়ো আন্নামালাই।

ঠিকই বলছি, দাদু। কোন ভুল আমার হয়নি। আমার মগজ তখন শার্সির মত পরিষ্কার ছিল। বলল ডেভিড।

কে একজন ফোড়ন কাটল, কী যে বল যত সব। এ আবার হয় নাকি ?

থাম, শালা ! ডেভিড কখনও মিথ্যে বলেছে তোদের ? এমন প্রশ্নে সত্যিই যেন ক্ষেপে উঠল ডেভিড।

না। কথাটা তা নয়। আমাদের এই সহরে হলে তবু কথা ছিল। কিন্তু তুমি দরিয়ার গব্বরের কথা বললে কিনা, তাই ভাবছিলাম—

থাম তোকে আর ভাবতে হবে না। তোর ভাবনার চেয়ে আমার এই চোখ দুটো বেশি সত্যি কি না, বল।

তা বটে। কথা বলল মহিম মিঞা।

আর সবাই অবাক হয়ে এ ওর চোখের দিকে চাইতে লাগল।

মূল ঘটনার এই হল প্রথম সূত্রপাত।

বলা নিষ্প্রয়োজন, ডেভিড যা বলল, সত্যিই কেউ যে তা বিশ্বাস করতে পারে নি সবার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। বরং পরে এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে অনেকে হাসাহাসি করেছে।

কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করল, বোঝা যাচ্ছে ডেভিডেয় এখন বয়েস হয়েছে। সত্যিই সে বুড়োতে শুরু করেছে এবার। কারণ বুড়ো মাল্লা ছাড়া এমন উদ্ভট গল্প কেউ করে না।

তবে সবাই ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলেও একজনের মনে ডেভিডের বর্ণনা কিন্তু গেঁথে রইল। সে বুড়ো সারেং মহিম মিঞা। সেদিন গভীর রাত পর্যন্ত সরাই-এ হৈ হুল্লোড় করার পর যখন বাড়ি ফিরল, তখন বার বার ডেভিডের কথাই মনে পড়তে লাগল তার। মনে মনে ভাবতে লাগল, লোকটা বলে কি? এমন ঘটনার কথা সে-ও তো কোনদিন শোনে নি? কথাটা উড়িয়েও দেয়া যায় না। বিশেষ করে ডেভিড যখন বলেছে। ডেভিডের ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। বাজে কথা বলার লোক সে নয়।

মহিম মিঞা পরদিন এ নিয়ে অনেকের সঙ্গে কথাও বলল। কিন্তু কেউই নতুন কিছু বলতে পারল না।

এই ঘটনার পর একে একে আরও নানা রকম সংবাদ শোনা গেল একের পর এক।

একজন জেলে খবর দিল, সে নাকি ডেভিডের দেখা জায়গাতেই অদ্ভুত কি সব দেখতে পেয়েছে। কতকটা তিমি মাছের মত। তবে মাছ নয়। অন্য কিছু হয়ত। তাদের গা দিয়ে রকমারী আলো বেরিয়ে আসছিল। লোকটি তাদের সন্ধ্যের দিকে দেখতে পায়। দূরে সমুদ্রের জলের ওপর তারা ভেসে বেড়াছিল। অনেকটা জায়গা জুড়ে। তারপর হঠাৎ সমুদ্রের জলেই তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঘটনাটা বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানান হয়। তাঁরাও এর কোন অর্থ বের করতে পারেন নি।

আর এক ঘটনার বর্ণনা দেয় বিদেশী কোম্পানির এক জাহাজের ক্যাপ্টেন। তিনি ওই একই জায়গায় অদ্ভূত একটি ব্যাপার দেখে চমকে উঠেছিলেন।

ভদ্রলোক লিখিতভাবে যে সংবাদটি পরিবেশণ করেন, তার সারমর্মঃ আমাদের জাহাজটি স্থির গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি আমার ক্যাবিন থেকে দূরের সমুদ্রের দিকে চেয়েছিলাম। তখন দুপুর। হঠাৎ মনে হল—আমাদের জাহাজ থেকে প্রায় চার নট দূরে। হ্যাঁ। বাইনিক্যুলার দিয়ে পরিষ্কার আমি সবটাই দেখতে পেয়েছি। দেখলাম, শান্ত সমুদ্রের এক জায়গায় খানিকটা জল যেন ফোয়ারার মত আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মেঘ নেই, বৃষ্টিও নেই। তবু জলের ফোয়ারা। প্রায় এক মিনিট ধরে ঘটনাটা ঘটল। তারপর নিস্তব্ধ সমুদ্র! অনেক সময় তিমি মাছ সমুদ্রে ভেসে থাকা অবস্থায় ওইভাবে জল ছিটোয়। কিন্তু ভারত মহাসাগরের এ অঞ্চলে তিমি মাছ আছে বলে তো জানা ছিল না?

ক্যাপ্টেনের ওই বর্ণনা কয়েকদিনের জন্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। একটি সরকারী অনুসন্ধানকারীদল এ নিয়ে অনুসন্ধানও চালায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কি, তার কোন হদিশ করতে পারে নি।

এই ভাবে গত কয়েক বছর ধরে কত রকমের বিক্ষিপ্ত ঘটনাই না শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এ সব নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামান নি।

অতঃপর !

হ্যাঁ, অবশেষে বলতে পারেন। শেষ পর্যন্ত ঘটল এক সাংঘাতিক ঘটনা। অতর্কিত। কিন্তু প্রাণঘাতী।

আর তারপর থেকেই সারা পৃথিবী জুড়ে শুরু হল প্রচণ্ড গুঞ্জণ। অবশেষে কেঁচো খুঁড়তে সাপ !

মসৃণ পথের ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে এ যেন অতর্কিত কোন গর্তের মধ্যে পড়ে যাওয়া।

গ্রেট নিকবরের বোলানগা বন্দরে এসে খবরটা প্রথম জানালেন দ্য শার্ক নামে একটি মালবাহী জাহাজের ক্যাপ্টেন ক্রিস্তোবাল হোসে তোবার হিহং। ইকুয়াডোরের নাবিক। লম্বায় প্রায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। অভিজ্ঞ এবং অসীম সাহসী হিসেবে যথেষ্ট তাঁর নাম ডাক। প্রচণ্ড ঝক্কির মুখোমুখি হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার মত তাঁর জুড়ি কমই দেখা যায়।

তবু মনে হল তিনি পুরোপুরি যেন চুপসে গেছেন। অমন একটা মানুষের মুখ ভয়ে যে কতখানি করুণ হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

পোর্ট অফিসার মিঃ মেনন বললেন, এখন আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, ক্যাপ্টেন হিহং। আপনার জাহাজ এখন আমাদের হেফাজতে। আপনার সমস্ত লোক লস্কর নিরাপদে রয়েছে।

গ্রাসিয়াস, অফিসার। বোলানগায় পৌঁছনোর পুরো তিন দিন পর এই প্রথম কথা বললেন ক্যাপ্টেন হিহং। যেন মৃত মানুষের কণ্ঠস্বর।

পোর্ট অফিসে মেননের নিজস্ব ঘরে একটি ইজি চেয়ারের ওপর বসে ক্যাপ্টেন হিহং। তাঁর পাশে একটি ছোট্ট টেবিলের ওপর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি। টেবিলের সামনে একটি কুশনে বসে রয়েছেন মেনন।

মেননের পাশে আর একটি চেয়ারে বসে রেডিও যোগাযোগ অফিসার সুখময় রায়।

ব্র্যাণ্ডির গ্লাসে খানিকটা চুমুক দিয়ে টেবিলের ওপর গ্লাসটিকে নামিয়ে রাখলেন ক্যাপ্টেন।

আপনাকে যথেষ্ট ধন্যবাদ, সিনর রায়। আপনার সাহায্য না পেলে শেষ পর্যন্ত আমাদের পাতালে গিয়েই বাস করতে হোত। কথা বললেন ক্যাপ্টেন হিহং।

এ আর এমন কি কাজ। আমি শুধু কর্তব্য পালন করেছি, ক্যাপ্টেন। স্বভাবসুলভ বিনয়ের সঙ্গে কথা বললেন তরুণ রেডিও অফিসার সুখময় রায়।

কর্তব্য তো আমরা সবাই পালন করি। কিন্তু জীবনের সেটাই শেষ কথা নয়, সিনর রায়। আপনি তার চাইতেও অনেক বেশি করেছেন আপনার সাহায্য না পেলে এতগুলি লোক বাঁচতে পারত ? উঃ! কী সাংঘাতিক ব্যাপার। নিমেষে, বিশ্বাস করুন মিঃ মেনন— হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে, বলতে পারেন পলকে, পর পর সাতটা ডিঙি তলিয়ে গেল। আর আমরা কিছুই করতে পারলাম না।—

মেনন বুঝলেন ক্যাপ্টেন হিহং আবার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। প্রচণ্ড মানসিক বিপর্যয়ে পর পর দুদিন তিনি যে মূক হয়ে বসে ছিলেন। সুখময় সে কথা তাঁকে আগেই জানিয়েছিল।

মেনন বললেন, আপনি একটু শান্ত হোন, ক্যাপ্টেন হিহং। মিঃ রায়ের কাছ থেকে আপনাদের রেসকিউ-এর কথা সব আমি শুনেছি। তখন আমি এখানে ছিলাম না। একটা জরুরী কাজ নিয়ে আমাকে কলকাতায় যেতে হয়েছিল। সেখানে বসেই মিঃ রায়ের পাঠান সংবাদটি পাই। ব্যাপারটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারি নি। গতকাল রাত্রে ফিরে এসেই মিঃ রায়ের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করে মোটামুটি সব কিছু জানলাম।

সুখময় বলল, আমি তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম, মিঃ মেনন।

আপনি ছিলেন না। পুরো দায়িত্ব আমার ঘাড়ে। ক্যাপ্টেন হিহং-এর প্রথম এস ও এস যখন পেলাম তখন সময় হবে প্রায় দশটা। উজ্জ্বল আকাশ। ভোর থেকেই সমুদ্রের ওপর ঝলমলে আবহাওয়া। অন্তত আমাদের চারপাশে দুশো মাইলের মধ্যে ঝড়ঝঞ্ঝা তো দূরের কথা, এতটুকু গোলমালও চোখে পড়ে নি। অথচ—

মেনন সুখময়কে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন। —যাক, বিস্তৃত বিবরণ পরে শুনব এখন, মিঃ রায়। হ্যাঁ ভাল কথা। ক্যাপ্টেন হিহং, আপনাদের কোম্পানির হেড অফিস কিতোতে খবর পাঠিয়েছিলাম। সেখান থেকে আজ সকালেই আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে তার জবাব পেয়ছি। ওঁরা জানিয়েছেন, দু একদিনের মধ্যেই এখান থেকে লোক যাচ্ছে।

গ্রাসিয়াস, মিঃ মেনন। সংক্ষেপে ধন্যবাদ জানালেন ক্যাপ্টেন হিহং।

ক্ষণিক বিরতি।

প্রশস্ত ঘরের মধ্যে মুখোমুখি বসে শুধু তিনজন মানুষ। সমুদ্রের কোল ঘেঁষে উঠে যাওয়া চারতলা বাড়ির দ্বিতলের বড় বড় সার্সির ভেতর দিয়ে দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের নিস্তরঙ্গ বিস্তৃতি। বাড়িটির বাঁ পাশে বন্দরের ফাঁড়ি। ফাঁড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনটি ভারতীয় জাহাজ। মাঝারি ধরণের। গোটা পাঁচেক পাইলট-লঞ্চ। লঞ্চগুলির কিছু দূরে ভেসে রয়েছে খাদ্যবাহী একটি অস্ট্রেলীয় জাহাজ নাম পেঙ্গুইন। ভিসাগাপট্টমে চালানী গম পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে জাহাজটির ইঞ্জিনে কী যেন একটা গোলমাল ধরা পড়েছিল। ফলে তার পক্ষে সরাসরি আর অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মেরামতির জন্যে বোলানগায় আশ্রয় নিতে হয়েছে। পেঙ্গুইনের ঠিক গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দ্য শার্ক। জাহাজটির নিচের অংশ গাঢ় লাল। অবশিষ্ট অংশ সাদা।

ক্যাপ্টেন হিহং করুণ দৃষ্টিতে দি দ্য শার্ককে একবার দেখে নিলেন।

তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির সুরে বললেন, আমার শার্কের কোন ক্ষতি হয়নি তো, মিঃ মেনন?

উত্তর দিল সুখময়। —না, তেমন কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু হালটা একটু তুমরে গেছে। ওটা সারিয়ে নিতে কোন অসুবিধে হবে না।

একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন যেন ক্যাপ্টেন হিহং। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন, তা ধকল তো কম যায় নি? কিন্তু এখনও আমি বুঝতে পারছি না মিঃ মেনন, কী করে এমনটি হওয়া সম্ভব। পাঁচ পাঁচটি মাছ ধরা লঞ্চ। তাদের মাঝি মল্লাদের সে কী করুণ চিৎকার লঞ্চগুলি চরকির মত ঘুরতে লাগল। আর চোখের পলকে রাক্ষসী সমুদ্র তাদের গ্রাস করে নিল। হরিবল্।

ক্যাপ্টেন ব্র্যাণ্ডির গ্লাশে চুমুক দিলেন।

মেনন বললেন, এমন সকালেই অত বেশি ড্রিঙ্ক করাটা ঠিক হচ্ছে না, ক্যাপ্টেন। মানে,—

না, না। ভয় পাবেন না, মিঃ মেনন। লাতিন আমেরিকার লোকেরা ও দিকটায় ওস্তাদ। আমার ঠাকুর্দা ভোরে উঠেই প্রথম তেষ্টা মেটাতেন এক গ্লাস তাকিলা দিয়ে। আমাদের কলজের জোর তো সে তুলনায় কম। থাক সে সব কথা। এখন মনে হচ্ছে আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছি। আমার মনে হয় ঠিক ঠিক যা ঘটেছে তার একটা রেকর্ড থাকা দরকার। অবশ্য মিঃ রায়কে এর আগে কিছু কিছু আমি বলেছি। তবে সে বলার মধ্যে কোন পারম্পর্য ছিল না। থাকাটা সম্ভব নয়। কারণ কী ঘটেছে সে সব কথা জানার চেয়ে কীভাবে আমাদের রক্ষা করা যায়, সেই চিন্তাতেই তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। আমাদেরও যেন একমাত্র চিন্তা 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র মত।

সুখময় বলল, আমার তো মাথা খারাপ হওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এমন একটা ব্যাপার—বলতে

কি, ক্যাপ্টেন, আপনার, এস, ও, এস যখন পেলাম, নিজের মগজকেই তখন যেন বিশ্বাস করতে পারি নি।

ঠিক কথা। বললেন ক্যাপ্টেন হিহং। —সারা দরিয়ার বুকটা, বিশ্বাস করুন– যেন একটা শান্ত সমাহিত পৃথিবী। তবু—। না। মিঃ মেনন, এ তিন দিনে নিজেকে আমি সামলে নিয়েছি। এবং আপনিও যখন এসে পড়েছেন, আমার মনে হয় ঠিক যা যা ঘটেছিল সেটা এখন নথিভুক্ত হওয়া দরকার।

মেনন এবার যেন খানিকটা আশার আলো দেখতে পেলেন। ক্যাপ্টেন হিহং-এর মুখের কথা লুফে নিয়ে তিনি বললেন, আসলে এটাই এখন সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, ক্যাপ্টেন হিহং। মিঃ রায়ের কাছে যতটুকু আমি জেনেছি সেটা শুধু আপনাদের রক্ষা করার ব্যাপারটা। এ তিন দিন আপনি বেশ কিছুটা বিচলিত ছিলেন বলে মিঃ রায় আপনাকে আর বিরক্ত করেন নি। সৌভাগ্য, এখন আপনি কিছুটা সামলে উঠতে পেরেছেন। এবার দয়া করে ঠিক গোড়া থেকে কী কী ঘটেছিল যদি বলেন, ভাল হয়।

আমার অভিজ্ঞতার বিবরণ তো—? ক্যাপ্টেন হিহং-এর জিজ্ঞাসা।

ঠিক তাই—। মেনন সম্মতি জানালেন।

আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। হিহং।

ধন্যবাদ। —হ্যাঁ, আর একটা কথা, যদি কিছু না মনে করেন ক্যাপ্টেন—আপনার বক্তব্য যদি আমারা টেপ করি, আপনার কোন আপত্তি নেই তো?

নিশ্চয় না। বরং সেটাই উচিত হবে।

মেনন কলিং বেল টিপলেন।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল বেয়ারা কাসেম।

মিঃ মেটাকে একবার ডেকে দাও, কাসেম। বল, তিনি যেন টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে আসেন। বললেন মেনন।

জি সাহাব। বলেই কাসেম চলে গেল।

মিনিট দুয়েক পর মেটা টেপ রেকর্ডার নিয়ে হাজির হল।

ক্যাপ্টেন হিহং স্থির হয়ে বসলেন। মেটা রেকর্ডারের মাইক্রো-ফোনটি তার সামানে বসিয়ে রাখল।

ক্ষণিক নিশ্চুপ হয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। সম্ভবত ওই সময়ের মধ্যে নিজের বক্তব্যটি মনে মনে গুছিয়ে নিলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে সুরু করলেন তাঁর অভিজ্ঞতার বিবরণ।

'শুনুন, মিঃ মেনন, তিন দিন আগে যা ঘটে গেল সংক্ষেপে আমি তার সমস্তটাই বলে যাচ্ছি।'

'আমার জাহাজ দ্য শার্কের গন্তব্যস্থল ছিল সিডনি। বলতে বাধা নেই, দ্য শার্ক আমার পুরনো জাহাজ। গত পনের বছর, হ্যাঁ, সরাসরি কাপ্টেন হিসাবেই গত পনের বছর আগে এই জাহাজে আমি যোগ দিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। তারপর দীর্ঘ পনের বছর পৃথিবীর কত দরিয়ায় পাড়ি দিয়েছি। আটলান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর—জীবনের বেশীর ভাগ সময় এ সব জায়গাতেই তো কেটে গেল। সমুদ্রের এপার ওপার করা—বিভিন্ন কোম্পানির মালপত্র পৌঁছে দেওয়া, বলতে পারেন, এই আমার কাজ। বলতে নেই, এই জাহাজের প্রায় সমস্ত মাঝিমাল্লা বা অফিসার সবাই পুরনো। সমুদ্রের বুকে ওদের প্রত্যেকেরই অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। কত ঝড় ঝঞ্ঝা আমরা গা বাঁচিয়ে চলেছি, সমুদ্রের কোন কোন জায়গা দিয়ে কী ধরণের স্রোত এঁকে বেঁকে চলেছে, সবই আমাদের জানা। ডুবো পাহাড়, ছোট খাটো মাথা উঁচু করা দ্বীপ, ওদের বার বার দেখে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, বলতে কি সে সব জায়গায় এলেই আমাদের নেভিগেটর চোখ বুজে বলে দিতে পারেন, কী তাঁকে করতে হবে।'

'কিন্তু সমস্তই কিছুই ভুল প্রতিপন্ন হল আজ থেকে তিনদিন

আগে। বলব কি মশাই, সকাল তখন প্রায় আটটা হবে। সারা রাতটা সমুদ্র বিষয়ক একটি বই পড়তে পড়তে বোধ হয় একটু বেশীই বিভোর হয়ে পড়েছিলাম। শুধু আমি কেন, আমার মনে হয়, সমুদ্র সম্পর্কে যার এতটুকু কৌতূহল আছে, তিনিও বিভোর না হয়ে পারতেন না। পড়া যখন শেষ হল, আমার ঘড়িতে তখন পাঁচটা।'

'এরপর ঘুমনোর আর মানে হয় না। আমার ক্যাবিন থেকে নীচে নেমে এসে ডেকের উপর কিছুক্ষণ পায়চারী করলুম। এই প্রাতঃ ভ্রমণটা আমার ছেলেবেলার অভ্যাস। বিস্তীর্ণ সমুদ্র। আমার শার্ক ভেসে চলেছে পুরো গতিতে। ইঞ্জিন ঘর থেকে গম গম শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর জলের ছলাৎ ছলাৎ আছড়ানি। পূব আকাশ ফাঁকা হয়ে গেছে। আকাশে মেঘ নেই। সমুদ্র অদ্ভুত রকম শান্ত।'

'কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে আবার ক্যাবিনে ফিরে এলাম। আমার ক্যাবিনের সঙ্গে স্নানের ঘর। ভোরে স্নান করা আমার আর একটি অভ্যাস। স্নান সারলাম। তারপর যতদূর মনে পড়ে, তখন সকাল প্রায় আটটা, স্টুয়ার্ট সাইমন আমার ক্যাবিনে ব্রেক্‌ফাস্ট রেখে গেল।'

কিন্তু যেই খেতে শুরু করেছি, আমার টেলিফোনটা বেজে উঠল যেন বাজ পড়ার মত। কী ব্যাপার? মনে মনে ভাবলাম। এই ভোরে কী এমন জরুরী কাণ্ড ঘটল যার জন্যে আমাকে টেলিফোন করতে হচ্ছে?

'ওলা! — ? টেলিফোনে কথা বললাম আমি।

বুয়েনস দিয়স! (শুভ দিন) সাইমন কথা বলছি, ক্যাপ্টেন। মনে হল সাইমনের কণ্ঠস্বর যেন কাঁপছে।

বুয়েনস দিয়স। তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কী ব্যাপার?

ঠিক বুঝতে পারছিনা, ক্যাপ্টেন। শার্ক যেন কেমন করছে। ঠিক পথে চলছে না।

এ সব আবার কী? ভোর বেলা আর মস্করা করার কিছু পেলে

না? ভোরেই খুব টেনেছ বলে মনে হচ্ছে? খানিকটা বিরক্তির সঙ্গেই কথা বললাম আমি। বলতে পারেন রেগেও যে যাই নি, সে কথাও বলব না।

প্লিজ ক্যাপ্টেন! অনুগ্রহ করে শুনুন। আমার মাথা সম্পূর্ণ পরিষ্কার। কাল রাতে এতটুকু ড্রিঙ্ক করি নি। আপনাকে বিরক্ত করতাম না। আধ ঘণ্টা ধরে শার্ককে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। মনে-হচ্ছে আমরা একটা অজ্ঞাত স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছি, ক্যাপ্টেন। সাইমনের কণ্ঠস্বর রীতিমত করুণ।

যাচ্ছেতাই কাণ্ড যত স া। চোরা স্রোত। চোরা স্রোত এখানে আসবে কোথায়? আমার কণ্ঠস্বর এবার বেশ ঝাঁঝালো হল।—

কথা শেষ হোল না। ক্যাবিনের দরজায় প্রায় ধাক্কা দিয়েই ভেতরে এসে ঢুকল ফাস্ট অফিসার আলবার্তো।

কী হোল, আলবার্তো? খাবার মাথায় রেখে আমি প্রায় লাফিয়েই উঠলাম।

সর্বনাশ, ক্যাপ্টেন! আমরা নির্ঘাৎ এবার নরকে চলেছি, উঃ! স্রোতের টান যে এমন হতে পারে, যেন বিশ্বাস করা যায় না। আলবার্তো হাঁপাচ্ছে।

বুঝলাম, কোনকিছু একটা ঘটেছে। নইলে আলবার্তোর মত দামাল নাবিক এমনিতে এত উতলা হওয়ার ছেলে নয়।

ক্যাপ্টেনের স্বভাবসুলভ স্থৈর্য নিয়ে এবার আমি বললাম, ঠিক আছে বাছা, একটু মাথা ঠাণ্ডা করে আসল ব্যাপার কী ঘটেছে একবার বল দেখি?

আলবার্তো বলল, আধ ঘণ্টা আগে প্রথমে নজরে পড়ে সাইমনের। কোথাও কিছু নেই। না ঝড়, না জোয়ার। হঠাৎ মনে হল, শার্কের যত জোরে চলা উচিত তার চেয়েও সে যেন বেশী জোরে চলছে। ব্যাপারটা প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারেনি। পরে নেভিগেটর

যোসেফকে কথাটা সে জানায়। যোসেফ সব কিছু শুনে বলল, তা কখনও হয় নাকি? ঝড় বাদল নেই, জোয়ার নেই, এমনকি কোন দ্রুতগতি স্রোতের মধ্যে গিয়ে যে জাহাজ পড়বে তারও জো নেই। এইতো, আমার সামনেই জাহাজ চলার ম্যাপটি বিছানো রয়েছে। বলুন দেখি আমরা ঠিক ভারত মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি নাকি? হ্যাঁ, ওই তো, সোজা আমাদের উত্তরে নিকবর দ্বীপপুঞ্জ। আশপাশে কয়েকটি ডুবো পাহাড় আছে। উত্তর পূর্বে বর্মামুলুক। কিন্তু এ সময়ে এখানে উটকো স্রোতই বা আসবে কোত্থেকে?

আলবার্তো বলতে লাগল, কী বলব ক্যাপ্টেন। যোসেফের কথা শুনে যেন মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমি পরিষ্কার দেখছি, আমরা একটা স্রোতের টানে ভেসে চলেছি, আর সে বলে কিনা— মানে এ সব সে বিশ্বাসই করতে চায় না? পরে জুলুম করার পর সে-ও পাইলট ক্যাবিনে ছুটে এল। আর তারপর তারও চোখ প্রায় ছানাবড়া। —আপনি এখুনি চলুন ক্যাপটেন। জাহাজকে রক্ষা করা হয়ত যাবে না। তবু,—।

আলবার্তোকে আর শেষ করতে দিলাম না। তার হাত ধরে সেই মুহূর্তেই ক্যাবিনের বাইরে বেরিয়ে এলুম।

ততক্ষণ সারা জাহাজটায় রীতিমত সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। মেট, স্টুয়ার্ট, মাঝি মাল্লা থেকে শুরু করে সবাই জোট পাকিয়ে দাঁড়িয়ে জাহাজের ডেকে। সবাই জাহাজের রেলিং ধরে ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে কী যেন দেখছে।

আমি ডেকের ওপর নামতেই সোরগোল পড়ে গেল।

কী ব্যাপার? যেন কিছুই হয় নি, এমন একটা ভাব দেখিয়ে কোন সংস্থার বড় কর্তা যেমন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীর জটলার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন, সেইভাবেই আমিও কথা বললাম।

জনদশেক লোক আমার সামনে এগিয়ে এল। তাদের সারা মুখে ভীতির করুণ চিহ্ন।

কোন কথা না বলে আমি এগিয়ে গেলাম ডেকের রেলিং-এর দিকে। রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে নিচে জলের দিকে চাইলাম।

কী বলব ? পরক্ষণেই আমার সারা দেহ যেন নিশ্চল হয়ে গেল। তখন নিজেদের কথা ভাবব না, ওদের—।

ওদের মানে ? মেনন প্রশ্ন করলেন।

ওই হতভাগা মেছো জাহাজীদের।

একটু থামলেন ক্যাপটেন হিহং। কী যেন ভেবে নিলেন মুহূর্তের জন্যে। ওঁর সারা মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল অজানিত এক আশঙ্কা —অথবা বলতে পারেন করুণা—তুই-ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ওঁর সারা মুখের ওপর।

খনিক বিরতি।

শুনুন মিঃ মেনন। এক যুগেরও বেশি সময় দরিয়ার বুকে তো ভেসেই কাটিয়ে দিলাম। আবার শুরু করলেন ক্যাপ্টেন হিহং। আপনাদের বঙ্গোপসাগরের মতিগতি আমাদের মত নাবিকের ভাল লাগে না। তবু বলব, তার অসংখ্য চোরা স্রোত, ঘূর্ণি এ সব আমার নখদর্পণে। তা ছাড়া এখন তো অক্টোবরের শেষ। এ সময়ে এ দিকটায় সমুদ্র তো শান্তই থাকে বরাবর দেখে এসেছি। কিন্তু ! বিশ্বাস করুন। জাহাজের সামনে দেখলাম—দরিয়ার জল যেন পাগল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বলব কি মশায়, ঘূর্ণি। অতবড় ঘূর্ণি জীবনে কখনও আমি দেখি নি। সে যা দৃশ্য। সমুদ্রের জল যেন পাগল হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। বড় বড় মাছের ঝাঁক সেই পাকের মধ্যে পড়ে দিশে হারা। দেখলাম, সেই ঘূর্ণি থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসার জন্যে কী প্রাণপণই চেষ্টা না তাদের। আর—হ্যাঁ। পাঁচ পাঁচটি মাছ ধরার বোট। ছোট খাটো লঞ্চ বলতে পারেন। সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে লঞ্চগুলি শাঁ শাঁ করে ঘুরে চলেছে। বোটগুলির মাল্লাদের সে কি চিৎকার। কী আর্তনাদ। মশায়, এই সমুদ্রের বুকে জাহাজ ডুবী হতেও দেখেছি। ঝড়ের তোড়ে পড়ে ঝাপটায় জাহাজ পড়ে পড় করে
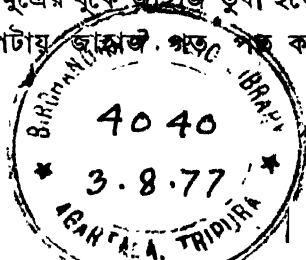
ছুটে চলেছে—তাও দেখেছি। কিন্তু সে সব ক্ষেত্রে নিজেদের বাঁচানোর সুযোগ থাকে। অথচ ওরা—ওই পাঁচটি লঞ্চের যাত্রীরা একান্ত অসহায়ের মত ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কত চেষ্টা! কার সাধ্য ঘূর্ণি থেকে ওদের রক্ষা করে। আমাদের জাহাজের উদ্দেশ্যে সংকেত জানিয়ে বার বার ওদের বাঁচানোর জন্যে আমাদের ডাকছে। দেখলাম, শাঁ করে একটি লঞ্চ আমাদের জাহাজের কিছু দূর দিয়ে চলে গেল। ওরা ঘুরছে তো ঘুরছেই। আর—বিশ্বাস করুন, মিঃ মেনন। মিনিট তিনেকের মধ্যে পাঁচটি লঞ্চ—আর তার সোয়ারিরা—টুপ করে দরিয়ার গহ্বরে তলিয়ে গেল।

কী বলছেন আপনি, ক্যাপ্টেন?

মেনন এবং সুখময় এবার যেন বিস্ময়ে ফেটে পড়বেন।

হ্যাঁ। আমরা নাবিক হয়ে নাবিকদের রক্ষা করতে পারি নি। কতকটা স্বগতোক্তির মত কথা বললেন ক্যাপ্টেন হিহং। সেই সঙ্গে পরাজয়ের দীর্ঘশ্বাস।

ইচ্ছে হোল, নিজের মাথার চুল ছিঁড়ি। দুগালে দুই থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে হল। নীরব দর্শকদের মত অতগুলি মানুষকে ডুবে যেতে দেখলাম—নাবিক হয়ে। ওদের কোন সাহায্যেই এলাম না, এ কি কম দুঃখ? বলুন, একজন নাবিকের কাছে একি কম গ্লানিকর? আমি না ক্যাপ্টেন! আস্ত একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন না আমি?

এতক্ষণ জাহাজের ওপর সবাই আমরা সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে হতভাগ্য ওই নাবিকদের দিকেই চেয়ে ছিলাম। তারপর ওরা যখন তলিয়ে গেল,—আমি তখন একটি আস্ত পাথর—!

সাইমনের স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি।—তাই তো?

ওরা না হয় মরল, কিন্তু আমরা?

ক্যাপ্টেন! সাইমন যেন উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল।—ক্যাপ্টেন, আমরাও যে দরিয়ার গোর হতে চলেছি!

সর্বনাশ! খেয়ালই ছিল না এতক্ষণ।

খেয়াল ছিল না, শুধু যারা মরল তারা নয়, ত্ব শার্কও ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে। পড়েই ছুটে চলেছে। কোন দিক পানে কে জানে?

না। আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম—মুহূর্তের জন্য হয়ত। তারপর শক্ত ক্যাপ্টেনের মত এবার নিজের ভূমিকা পালন। আমি না জাহাজের ক্যাপ্টেন! আস্ত একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন না আমি। জাহাজের নিরাপত্তা, এতগুলো মানুষের জীবন—এ সব আমার হাতে না?

আলবার্তো বলল, শুনুন স্যার। আমার কথা একটু মালুম করুন। মিনিট পনের আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। শার্ক যেন আমার কথা শুনছে না। ডান পাশে বাঁক নিয়ে কোথায় যেন ছুটে চলেছে।

অদ্ভুত ব্যাপার তো?

এতক্ষণে খেয়াল হল আমার। পরিষ্কার ঝলমলে দিন। বাতাসে কোন নিম্নচাপ নেই। আকাশে এতটুকু মেঘ নেই। যে জায়গা দিয়ে চলেছি, সেখানে এ সময়ে সমুদ্র শান্তই থাকে। তবু—

আমরা একটা অজানা স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছি, ক্যাপ্টেন! কথা বলল সাইমন। যেন সে কেঁদেই ফেলবে এবার।

অজানা স্রোত—না এই ঘূর্ণি? ঘূর্ণিই বা এ সময়ে এলো কোথা থেকে। সম্বিৎ ফিরে পেলাম আমি।—তাই তো হচ্ছে কি এসব? মনে পড়ে, শার্ক-কে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে একবার টাইফুনের মধ্যে পড়েছিলাম, সে না হয় বোঝা গেল। টাইফুনকে দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু, শান্ত এই সমুদ্র—এই ভারত মহাসাগর। এমন সময় এ সব আবার কী?

এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলে না।

সঙ্গে সঙ্গে সাইমন এবং আলবার্তোকে নিয়ে ছুটে গেলাম নেভিগেশন রুমে। জায়গাটা দেখে নিলাম। রেডিও অপারেটারকে বললাম, এস ও এস পাঠাও। তখন আমরা ঠিক কোথায় রয়েছি তাও বুঝতে পারলাম না।

অপারেটার এক মিনিট অন্তর অন্তর আশপাশের বন্দরের উদ্দেশ্যে

সাহায্য চেয়ে এস ও এস পাঠাতে লাগল।

আর আমি নিলাম সোজা জাহাজ চালানোর দায়িত্ব।

দায়িত্ব তো নিলাম। ভেবেছিলাম, এ আর তেমন কি শক্ত কাজ। এই করেই তো সারাটা জীবন কাটল। কিন্তু কি বলব, মশায়, যা ভেবেছিলাম, তা নয়। সে স্রোতের টান যে কী, আপনারা বুঝবেন না। সেই টানের মধ্যে পড়ে, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার শার্কও যেন পাগলা হয়ে উঠলো। হালে কোন কাজই হল না। প্রচণ্ড গতিতে জাহাজ কোথায় যে ছুটে চলল, আমি নিজেই বুঝতে পারলাম না।

তখন আমি রীতিমত শঙ্কিত। শেষ পর্যন্ত ওই ঘূর্ণির মধ্যে গিয়ে পড়বো না তো? সে রকম হলে আমাদের ভাগ্যও যে সেই পাঁচ পাঁচটি লঞ্চ যাত্রিদের মত হবে, সে তো বুঝতেই পারছি।

ভাবুন ব্যাপারখানা। ঝড় নেই, জল নেই, ঘন কুয়াশা নেই, রোদ্দুরের আলোয় চার পাশ ঝলমল করছে। দূরে সমুদ্রের যতটা দেখা যায়, সব শান্ত। কোন আলোড়ন নেই কোথাও। শুধু যা কিছু ঝামেলা, এখানে। যেখানে আমাদের জাহাজটা ঘটনাচক্রে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

ওদিকে রেডিও অপারেটার ঘন ঘন এস ও এস পাঠিয়ে যাচ্ছে। —সাহায্য চাই, আমরা বিপন্ন।

মাঝিমাল্লারা ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। ব্যাচা.দের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে চলল তুমুল কসরৎ। আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম, যতটা সম্ভব জাহাজটা যাতে ঘূর্ণির কেন্দ্রের দিকে না এগিয়ে যায়।

এদিকে প্রপেলারেব একটি ব্লেড-এ চিড় ধবল। শুধু চিড় নয়। তার একটা পাশ ভেঙ্গে গেল।

মাল্লা ডিক ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল, হুজুর সর্বনাশ হয়ে

গেছে। প্রপেলার ভেঙে দু টুকরো।

বলুন, এর পর কার আর মাথার ঠিক থাকে ?

ভাগ্য ভাল, এই সময় মাথার ওপর দেখতে পেলাম একটি হেলিকপটর।

সুখময় বলল, আমাদের হেলিকপটর। নিকবর থেকে যাত্রা করে সমুদ্রে সেটা টহল দিচ্ছিল। বলতে পারেন, এটা যোগাযোগ। ওই দিন ভোরে আমরা খবর পেয়েছিলাম, একটি ছোট্ট লাল রং-এর লঞ্চ ভিসাকাপট্টম থেকে সোনা পাচার করে বর্মার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হেলিকপটরে করে আমাদের কয়েকজন অফিসার তারই খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। এমন সময় পেলাম, আপনার এস ও এস। খবরটা ওদের জানিয়ে দিলাম। হেলিকপটরটি আপনার জাহাজ থেকে প্রায় মাইল পঞ্চাশ দূরে টহল দিচ্ছিল তখন।

হ্যাঁ মশায়। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। বললেন ক্যাপ্টেন হিহং। আপনাদের হেলিকপটর না এলে—নির্ঘাৎ আমাদের মৃত্যু।

সুখময় বলল, হেলিকপটর থেকে শুল্ক অফিসার নরেন ভটচাজ জানালেন, আপনাদের জাহাজ নাকি একটি চোরা স্রোতের মধ্যে পড়েছে।

যতদূর সম্ভব, আমাদের অবস্থাটা ওঁকে জানানোর চেষ্টা করে-ছিলাম।—বললেন ক্যাপ্টেন হিহং।

এ ক্ষেত্রেও বলব যোগাযোগ। বলল সুখময়।—আপনাদের খবর পেতেই কী দুর্ভাবনাই যে হল! মিঃ মেনন নেই। সমুদ্রের গতিবিধি সম্পর্কে আমার তো জ্ঞান সেই অ আ ক খ। ভাগ্য ভাল, পোর্ট-সেফটি অফিসার বালকৃষ্ণণ কী একটা কাজে যেন আমার ঘরে এসেছিলেন। কথাটা তাঁকে বলতেই তিনিও কেমন যেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নরেন ভটচাজ যে খবর পাঠিয়েছিলেন, তাতে বুঝলাম, বোলানগ্যা থেকে সোজা দক্ষিণে গ্রেটচ্যানেলের মধ্যে কোন এক জায়গায় আপনারা অবস্থান করছেন। বালকৃষ্ণণ বললেন,

অক্টোবরের শেষ থেকে ও অঞ্চলের সমুদ্রতো খুবই শান্তই থাকে। আর ঘূর্ণি? তেমন কোন ঘূর্ণির কথা নটিক্যাল অ্যালমানাক-এ লেখা আছে বলে তো মনে হয় না? আমি তাঁকে বললাম, নটিক্যাল অ্যালমানাকে কী লেখা আছে, কী নেই, সে নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর মানে হয় না, বালকৃষ্ণণ। রূঢ় বাস্তব এই, শ খানিক জ্যান্ত মানুষ সেখানে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। তাদের বাঁচানোই এখন আমাদের প্রধান দায়িত্ব।

—কেন? তোমরা দরিয়ার কাছে কোলে আর কোন জাহাজ ছিল কী না তার খোঁজ নাও নি? প্রশ্ন করলেন মেনন।

—সেটা নিলাম বলেই তো ওরা বেঁচে গেল ক্যাপটেন হিহং-এর জাহাজ যে জায়গায় বিপদে পড়েছিল সেখান থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে আমাদের শিপিং করপোরেশনের একটি মালবাহী জাহাজ পেনাং থেকে মাদ্রাজের দিকে আসছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

—কোন জাহাজ? মেননের জিজ্ঞাসা।

—অজন্তা।

—ও। মিঃ কুলকারনির জাহাজ। কুলকারনিতো ঝানু ক্যাপ্টেন।

—ঠিক তাই। ক্যাপ্টেন কুলকারনিকে খবর পাঠান হোল। যোগাযোগ ভালই। জাহাজটিও বড়। সেই সঙ্গে নরে ভটচাজকে জানালাম, অজন্তার সঙ্গে সহযোগিতা করে শার্ককে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে যান।

আর এক চুমুক ব্র্যাণ্ডি পান করলেন ক্যাপ্টেন হিহং। তারপর হাতের গ্লাশটি পাশের টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলেন।

মেনন বললেন, বলুন ক্যাপ্টেন, তারপর? সাহায্য ঠিক সময় পেলেন তো?

না পেলে আর আপনাদের সামনে বসে এমন করে কথা বলছি কি করে? শুরু করলেন হিহং। —হেলিকপটর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হল। অজন্তা ঘণ্টা আড়াই এর মধ্যে আমাদের কাছাকাছি হল। কিন্তু শেষ সময়ে বিপদে পড়লাম আবার। ক্যাপ্টেন কুলকারনিকে তো আর আমাদের স্রোতের মধ্যে টেনে আনতে পারি না? তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম। শার্ক যেন ঘূর্ণির ঠিক গা ঘেঁষে চলেছে। মানে ঘূর্ণি-স্রোতের দিকটা থেকে শান্ত সমুদ্রের দূরত্ব শ' খানিক গজ হবে। বুঝলাম, কোন ভাবে ওই শ' খানিক গজ কেউ যদি আমাদের জাহাজটিকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তবেই যা বাঁচোয়া। —ক্যাপ্টেন কুলকারনিকে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। সেই মত, দুটো মোটা নাইলনের কাছি শক্ত করে তিনি তাঁর জাহাজের সঙ্গে বেঁধে নিলেন কাছি দুটির ডগা তুলে নেয়া হোল হেলিকপটরে। আর আস্তে আস্তে অত্যন্ত সাবধানে হেলিকপটরে করে কাছির ডগা পৌঁছে দেওয়া হল আমাদের জাহাজে।

ভাবুন ব্যাপারখানা। স্রোতের টানে আমাদের জাহাজ ছুটে চলেছে। তার সঙ্গে সমান্তরাল দূরত্ব রেখে এগিয়ে চলেছে অজন্তা। আর মাথার ওপর দিয়ে কাছি নিয়ে এগিয়ে আসছে হেলিকপটর। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, মিঃ মেনন। কাছির ডগা দিয়ে শার্কের সামনের রিং দুটো আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে নিতে দেরি হল না। আমাদের প্রপেলার এর মধ্যে অকেজো হয়ে গেছে। হাজার হলে যন্তরেরও তো একটা ক্ষমতা আছে? আমরা না হয় প্রাণের দায়ে যতো জোর সম্ভব তাকে চালিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু মেহনত সে সইবে কী করে? হঠাৎ তার একটি অংশ ভেঙ্গে গেল। —কিন্তু না। ভাগ্য ভাল। অজন্তার কাছিতে ততক্ষণে টান ধরেছে। খুব সন্তর্পণে অজন্তা শার্ককে টানতে শুরু করল। তাতে কাজও হল। শার্ক এতক্ষণে ধীরে ধীরে স্রোত থেকে বাইরে এগোতে লাগল। এবং শেষ পর্যন্ত অনিবার্য মৃত্যুর

হাত থেকে আমরা বেঁচে গেলাম। পরে অজন্তাই কোন রকমে এই বন্দর পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়েছে।

থামলেন ক্যাপ্টেন হিহং।

মেটা টেপ রেকর্ডার বন্ধ করল।

মেনন বললেন, এখন আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ক্যাপ্টেন। আপনার জাহাজে মেরামতি চলছে। খবর পাঠিয়েছি। আগামীকাল সকাল নাগাদ আপনার কোম্পানির কর্তারাও এসে যাচ্ছেন। —ভাল কথা। আপনাদের কোন অসুবিধে হচ্ছে নাতো ?

মোটেই না। আপনারা আমাদের যে সেবা যত্ন করছেন, ধন্যবাদ জানিয়ে তা খাটো করতে চাই নে। বরং খুব কষ্ট দিলাম আপনাদের। বিনয়ের সঙ্গে কথা বললেন ক্যাপ্টেন হিহং।

ধন্যবাদ! বললেন মেনন। —এখন আপনি বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার আসছেন আপনার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্যে। আমরা একটু কর্তব্য কর্ম করে নিই, কেমন ?

নিশ্চয়। এখন আমার কোন চিন্তা নেই। আপনি কাজ করুন। বললেন ক্যাপ্টেন হিহং।

সুখময়কে সঙ্গে নিয়ে মেনন এবার তাঁর নিজের অফিস ঘরে গিয়ে বসলেন। আপাততঃ কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কাজ তাঁকে সেরে নিতে হবে।

প্রথম মেটাকে ডাকা দরকার।

কলিং বেল টিপলেন।

কাসেম এল।

মেটাকে ডাকতো একবার? বললেন মেনন। তারপর সুখময়ের দিকে চেয়ে বললেন, ক্যাপ্টেন হিহং-এর জাহাজ সম্পর্কিত রিপোর্টটি তৈরি আছে তো, মিঃ রায় ?

তৈরি করে রেখেছি। আমি এখুনি দিচ্ছি আপনাকে। বলে রিপোর্ট আনার জন্যে সুখময় পাশের ঘরে তার নিজের অফিসে চলে গেল।

মেটা এল এর পরমুহূর্তেই।

স্যার।

হ্যাঁ, দেখ, মিঃ মেটা, যে টেপটি এইমাত্র করলে তার গোটা চারেক প্রিন্ট তৈরি করবে। আজই। একটি আমাদের কলকাতা অফিসে পাঠাও। আর একটি পাঠাও দিল্লিতে পররাষ্ট্র দপ্তরে। বাকি দুটো প্রিন্ট রেখে দাও। বললেন মেনন।

ইয়েস স্যার!

মেটা চলে গেল।

সুখময় এল।

মেনন সুখময়ের কাছ থেকে রিপোর্টটি নিয়ে তার ওপর একবার চোখ বোলালেন। না, রেকর্ড করার সময় ক্যাপ্টেন হিহং যা বলেছেন তার সঙ্গে সুখময়ের রিপোর্টের মিল আছে। এই মিলটাই থাকা দরকার। নইলে এসব ক্ষেত্রে এতটুকু ফারাক থাকলেই আন্তর্জাতিক মহলে কথা উঠবে। কী থেকে কী দাঁড়ায় তা তো বলা যায় না?

কিন্তু প্রশ্ন হোল, সমুদ্রের ওপর অমন একটি ঘূর্ণির কারণ কী? সত্যিই এ যেন ভৌতিক ব্যাপার। পাঁচ পাঁচটা মোটর লঞ্চ আরোহী সমেত ডুবে গেল। মোটর লঞ্চগুলি কাদের? সবাই তখন প্রাণের তাগিদে এতই ব্যস্ত ছিল, এই সামান্যটুকু খবরও না পেরেছে ওরা বলতে, না ক্যাপ্টেন হিহং জানার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যাপারে একটু গোলমাল বাধবেই।

যাই হোক, আপাততঃ বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

মেনন সুখময়ের রিপোর্ট এবং এক কপি টেপ রেকর্ড নৌ-পরিচালনা দপ্তরে পাঠিয়ে দিলেন।

মূল ভূখণ্ড থেকে বহু-দূরে সমুদ্রের বুকে এমন যে একটি ঘটনা ঘটল—প্রথম চারদিন সে সম্পর্কে তেমন কিছু বোঝা গেল না। এমন কি নিকবর থেকে পোর্ট ব্লেয়ার—কাছাকাছি হলেও নিকবরের কথা সেখানেও গিয়ে পৌঁছলো না। এতে কোন অস্বাভাবিকতা কিছু

নেই। সমুদ্রের এই একান্ত পরিবেশে অত শত নিয়ে কে আর তেমন মাথা ঘামাতে চায় ?

চারদিন পর দিল্লির একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠান সংবাদটি প্রথম প্রকাশ করে বসল। বলা বাহুল্য, সংবাদদাতা মূল ব্যাপারটার গুরুত্ব হয়ত তেমন বুঝতে পারেনি, তাই যতদূর সম্ভব, খুব সংক্ষেপে যে টুকু কথা সে পরিবেশন করল তার সারমর্ম ঃ

ইকুয়াডোরের একটি জাহাজ গ্রেট চ্যানেলের মধ্যে একটি ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কোন ক্রমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। এই ঘটনায় জাহাজের কিছুটা ক্ষতি হয়। তবে নাবিকরা সবাই সুস্থ আছে। পোর্ট বোলানগায় জাহাজটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয়েছে।

সংবাদে লঞ্চডুবির কোন কথা নেই।

বোঝা গেল সংবাদদাতা সরকারী সূত্র থেকেই সংবাদটি সংগ্রহ করেছিল। সরকার থেকেই লঞ্চডুবির কথাটা চেপে গেছে। কারণও ছিল। এ ধরণের খবর জানাজানি হলে সারা দেশ জুড়ে প্রচণ্ড একটা হৈ চৈ উঠতে পারে। কারণ, যারা ডুবে মরেছে তারা সবাই ভারতীয়। দিন পাঁচেক আগে মাদ্রাজ থেকে মাছ ধরার যে জাহাজটি বঙ্গোপ-সাগরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মাছের ঝাঁকের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ছোট ছোট সেই পাঁচটি লঞ্চ তার সঙ্গেই ছিল। জাহাজটির নাম মালাবার। জাহাজটির ক্যাপ্টেন জানিয়েছে, সমুদ্রে জাহাটিকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে পাঁচটি লঞ্চ নিযে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ এবং নাবিকদের তিনি সেখানে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কথা ছিল, ওরা বিস্তীর্ণ একটি এলাকা জুড়ে সন্ধান চালাবে। এবং সেই মত যথা সময়ে কাজও শুরু হয়। কিন্তু লঞ্চগুলি সমুদ্রের বুকে এগোতে এগোতে জাহাজটি থেকে হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বেতার সংকেতও পাওয়া যায় নি। এতে মনে হয়, ওরা অনেক দূরে সরে গেছে। ফলে ওদের লঞ্চে স্বল্প

শক্তির যে বেতার যন্ত্র ছিল তার পাঠান সংকেত জাহাজ পর্যন্ত আর আসতে পারে নি।

মালাবার ক্যাপ্টেন খবরটা মাদ্রাজে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ঠিক সময় মঞ্চই। তাঁর কথামত সামরিক প্লেন পাঠিয়ে দিয়ে অনুসন্ধানও চালান হয়। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকা ঘুরে এসে তারা জানিয়েছে, কোন লক্ষই তাদের নজরে পড়ে নি।

পাছে এ খবরে সারা দেশ জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়, সেই ভয়ে কর্তৃপক্ষ আপাততঃ খবরটি যতদূর সম্ভব গোপন করার চেষ্টা করলেন। ওঁরা ঠিক করলেন, আরও অনুসন্ধান করে যা হয় করা যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তাল সামলান গেল না। এবং ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে সাপ তোলার মত অবস্থা দাঁড়াবে সে কথা কেউ কি কল্পনা করতে পেরেছিলেন ?

ক্যাপ্টেন হিহং যে দিন দুর্ঘটনার সামনে পড়েন, ঠিক তার আগের দিন বাঙ্গালোরের ভূ-কম্পন পরিমাপক যন্ত্রটি কয়েক মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন অদ্ভুত রকমের খামখেয়ালী হয়ে উঠেছিল।

রাত তখন প্রায় একটা।

ইলেকট্রোনিক যন্ত্রে ঠাসা একটি ঘরের মধ্যে বসে ছিলেন ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানী ডঃ বাসু। ভদ্রলোকের বয়েস বছর তিরিশ। কিন্তু ভূ-পদার্থ বিজ্ঞানের ওপর কয়েকটি মৌলিক গবেষণা করে এই বয়সেই তিনি আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। সম্প্রতি আফ্রিকার গোল্ড কোস্ট থেকে ঘুরে এসে কী যেন একটা নতুন পরীক্ষার কাজে হাত দিয়েছেন। সেটা যে কী খোলাখুলি ভাবে এখন পর্যন্ত তিনি কাউকে বলেন নি! বাঙ্গালোরের ওই যন্ত্রপাতি ঠাসা ঘরের মধ্যেই গত সাত দিন ধরে ঠায় বসে রয়েছেন। তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁরই ছাত্রী ডঃ সুমিত্রা মালহোত্রা। বছর আটাশ বয়সের মিস্ মালহোত্রা এ সাত দিন যে ছায়ার মত ডঃ বাসুর সঙ্গে লেগে রয়েছে।

এ যেন এক অদ্ভুত নেশা।

পৃথিবীর বুকের ওপর প্রাণের চাঞ্চল্য। কত রকমের প্রাণী, কত রকমের উদ্ভিদ, নদীনালা, হ্রদ। অথবা বিচিত্র পাহাড় পর্বত। কিন্তু এদের নিচে, পৃথিবীর ভূস্তরের মাত্র কয়েকশ' ফুট গভীর থেকে যে অজ্ঞাত জগতের শুরু, তার অনেক কিছুই এখনও পর্যন্ত অজানাই থেকে গেছে। সব কিছু নয়। শুধু ভূ-কম্পনের ব্যাপারটা। গত তিন বছর ডঃ বাসু এই ভূ-কম্পনের কারণ জানার উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীটা চষে বেড়িয়েছেন। বিভিন্ন জায়গা থকে ভূ-তাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়েছেন। এবং তাদের উপর ভিত্তি করে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন নতুন একটি তত্ত্ব। ওঁর ধারণা, এই তত্ত্ব অদূর ভবিষ্যতে ভূমিকম্পের পূর্বাভাস জোগাতে সাহায্য করবে। দাক্ষিণাত্যের পর্বতবহুল অঞ্চলে বসে গত তিন মাস এই নিয়েই গবেষণা করেছেন তিনি। তাঁকে সাহায্য করেছেন ডঃ সুমিত্রা মালহোত্রা।

সুমিত্রা শিল্পীর মেয়ে। ওর বাবা ওকে শিল্পী করেই গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে হয়ে দাঁড়াল ভূ-বিজ্ঞানী। ও নিজে বলে, যা করছি, তাও তো শিল্প। তুলির টানে একজন শিল্পী যেমন জীবনের সূক্ষ্ম স্বরূপকে চিহ্নিত করে, অঙ্কের মধ্যে দিয়ে আমিও তো সেই জীবনকেই প্রকাশ করছি। জীবনের জীবন। এ: পৃথিবীটা। যাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই বিচিত্র জীবজগৎ।

রাত তখন প্রায় একটা। কতকগুলি ডেটা নিয়ে অঙ্ক কষছিল সুমিত্রা। ডঃ বাসু ভূ-কম্পন লেখাচিত্রের ওপর ঝুঁকে রাত বারোটার পর থেকে এ পর্যন্ত পৃথিবীটা কী ভাবে কেঁপেছে, পরীক্ষা করছিলেন। লেখচিত্রের চৌকো ছোট ছোট ঘরের ওপর আঁক কষে চলেছে ছোট্ট একটি নিবের ডগা। পাশে যন্ত্র গণক। মাঝে মাঝে সেই যন্ত্র গণক থেকে মৃদু খটাখট শব্দ হচ্ছে।

দুটি মানুষ। একই ঘরের নির্জনতায় যেন পুরোপুরি নিমজ্জিত।

যেন ওঁরাও যন্ত্রের পাশে থেকে যন্ত্রই হয়ে গেছেন।

সুমিত্রা কিছুক্ষণ আগে গরম কফির কথা বলেছিল। মাঝে মাঝে কফি তৈরি করার সে দায়িত্ব নিয়েছে।

মাত্র মাস চারেকের পরিচয়। কিন্তু এই মেয়েটির ওপর ডঃ বাসুর এরই মধ্যে অনেকটা যেন বিশ্বাস জন্মেছে। কম কথা বলে সুমিত্রা। কোন প্রশ্ন করলে সংক্ষেপে উত্তর দেয়। ওর সারা মুখে সব সময় একটা গভীর আত্ম মগ্নের ছায়া ওকে যেন আরও কমনীয় করে তুলেছে। তার সঙ্গে প্রচণ্ড আকর্ষণ করার ক্ষমতা।

সুমিত্রাও বোধ হয় ডঃ বাসুর মানসিকতাকে বুঝতে পেরেছিল। ডঃ বাসুও কথা বলেন কম। কথা যখন বলেন, চোখের ওপর চোখ রেখে কথা বলেন। তখন তাঁর দৃষ্টির মধ্যে ফুটে উঠে গভীর জিজ্ঞাসার চিহ্ন। যেন মানুষটাও একটি রহস্যজনক পৃথিবী।

ডঃ বাসু বললেন, সুমিত্রা, কফি।

সুমিত্রা বলল, আর এক মিনিট। পারকোলেটারে চাপিয়েছি। তৈরী হয়ে এল।

ধন্যবাদ!

মুখের শব্দ তখনও বুঝি ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়!

—সাংঘাতিক কাণ্ড! দেখ, দেখ। কাঁটাটা কেমন সোজা ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে! না না আমি কি ভুল দেখছি? ডঃ বাসু হঠাৎ বিস্ময়ে যেন লাফিয়ে উঠলেন।

কী ব্যাপার? মুখ তুলে চাইল সুমিত্রা।

এ দিকে এসে একবার দেখ দেখি। ভুল দেখছি না তো? কথা বললেন ডঃ বাসু।

সুমিত্রা তার স্বভাব সুলভ শান্ত ভঙ্গীতে উঠে এসে ডঃ বাসুর পাশে দাঁড়াল।

কিন্তু মুহূর্তের জন্যে।

—এত প্রচণ্ড! শুধু এই দুটি শব্দই সে উচ্চারণ করল। কারণ এর বেশি বলার মত ভাষা সেও যেন হারিয়ে ফেলেছে।

হ্যাঁ। প্রচণ্ড ভূকম্পনের সংকেত ধরা পড়েছে ডঃ বাসুর সামনের ওই যন্ত্রে।

কিন্তু বেশি কথা বলার সময় এখন নেই। এত প্রচণ্ড কম্পন কোথায় ঘটতে পারে এখনই বের করতে হবে।

বেশি দেরি হল না।

মনে হল আন্দামান সাগরের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

সুমিত্রা হিসেব কষে বলল, যে ভাবে পৃথিবীটা দুলে উঠেছে, তাতে মনে হয় যে ভূকম্পনটি ঘটল তার ঘাত একশ কিলোটন টি এন টি'র বিস্ফোরণ ক্ষমতার সমান।

না! শুধু ডঃ বাসুই নন। পৃথিবীর অন্ততঃ দশটি মান-মন্দির থেকেই এই ভূকম্পনের কথা পরদিন প্রচারিত হল। বেতার এবং টেলিভিশনের প্রাতঃকালীন সংবাদে জানান হল, আজ ভোর রাত্রে বঙ্গোপসাগরের কোন এক জায়গায় প্রচণ্ড ভূকম্পন হয়েছে। কম্পনের মাত্রা দেখে মনে হয় কোন আগ্নেয়গিরি বুঝি পুরোপুরি ফেটে আকাশ পানে ছুটে গেছে।

সাংবাদিকরা বেশ খানিকটা কল্পনার প্রলেপ লাগিয়েই ঘটনাটিকে প্রচার করল।

কিন্তু প্রশ্ন এই, বঙ্গোপসাগরের যে অঞ্চলটিতে ভূ-কম্পন ঘটেছে বলে বলা হল, সেখানে কোন আগ্নেয়গিরি আছে, এমন কথা কখনও তো শোনা যায় নি?

শুরু হল রীতিমত তোলপাড়।

পরদিন ভোরে ডঃ বাসুর কাছে একের পর এক টেলিফোন

আসতে লাগল।

ভোর ছ'টা নাগাদ প্রথম কল পেলেন ম্যানিলা থেকে। কথা বললেন বিশিষ্ট ভূকম্পন বিশারদ ডঃ লিং।

—ডঃ বাসু। ইউ ফেল্ট হোয়াট হ্যাপেন্ড দিস নাইট ?

—ডঃ লিং কথা বলছেন ? হ্যাঁ, হ্যাঁ। এত বড় ভূ-কম্পন কী করে হওয়া সম্ভব। এখানকার সিসমোগ্রাফ যে কী দারুণ-ভাবে কেঁপে উঠেছে—এমন অভিজ্ঞতা এর আগে আর কখনও আমার হয় নি। গুছিয়ে কথা বলার মত ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছেন ডঃ বাসু।

—যাক। তা হলে নিশ্চিন্ত হলাম। একটা কিছু তাহলে ঘটেছে। আমি তো মশাই, বিশ্বাসই করতে পারছি না। আমার মনে হয়েছিল আমার যন্তরটিই বুঝি খারাপ হয়ে গেছে। তখন মনে হল আপনার কথা। এ ব্যাপারে আপনি তো একজন স্বনামধন্য গবেষক। কথা বললেন ডঃ লিং।

—না, ডঃ লিং। আপনার যন্ত্র ঠিকই আছে। কোন ভুল সংকেত ধরা পড়ে নি।

—পড়ে—নি। বলছেন কি, ডঃ বাসু ? বুঝতে পারছেন, এর মানে করলে কী দাঁড়ায় ?

—জানি। কম করেও একশ কিলোটন টি এন টি বোমার বিস্ফোরণের মত ক্ষমতা এই ভূ-কম্পনের—

—কিন্তু এতটা কী করে সম্ভব ? আমার মনে হচ্ছে, ভারত মহাসাগরের গ্রেট চ্যানেলের কাছে কোথাও হবে। সেখানে তো সব খুদে খুদে দ্বীপের আস্তানা। উত্তরে অবশ্য আন্দামান, নিকবর—! এমন কম্পন একমাত্র আগ্নেয়গিরি যদি উড়ে গিয়ে থাকে তবেই সম্ভব। কিন্তু ও তল্লাটে আগ্নেয়গিরি কোথায়, ডঃ বাসু ? বলুন, আছে কি ?

—তা নেই। তবে দেখা যাক কোন খবর আসে কী না ?

সকাল ছ'টা থেকে সাতটা। এই ঘণ্টায় কম করেও পৃথিবীর পাঁচটি মান মন্দির থেকে কল পেলেন ডঃ বাসু। সবাই বড় বিজ্ঞানী। ডঃ বাসুর গুণমুগ্ধ এবং কতকগুলি বিষয় নিয়ে একই ধারায় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। ওঁদের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা। একটা বড় রকমের ভূ-কম্পন যে ঘটেছে এবং ঘটেছে আন্দামান সাগর অথবা গ্রেট চ্যানেলের কোন এক জায়গায় দেখা গেল এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত নন এবং সবারই এক সিদ্ধান্ত; এত বড ভূ-কম্পন বড় রকমের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ছাড়া আর কিছু থেকে হতে পারে না।

অথচ অদ্ভুত ব্যাপার এই যে অঞ্চলের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে আগ্নেয়গিরি আছে বলে কারোর জানা নেই।

সেই একটার পর থেকে সুমিত্রা এতক্ষণ প্রায় নিশ্চুপই বসে ছিল বলা চলে। মাঝে বার তিনেক সে ডঃ বাসুকে কফি খাইয়েছে এই যা। ভোর হতেই অনেকেই ছুটে এসেছে। তবে সেটা শুধু কৌতূহলী হয়ে। রেডিওতে সংবাদ শোনার পর। কৌতূহল, বাঙ্গালোরের সিসমোগ্রাফে এত বড় ঘটনা ধরা পড়েছে কী না, সেটা জানতে।

অথচ কী সংকীর্ণ ওদের মন! শুধু জানা নয়, সারা পৃথিবীর চোখ যে এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিজ্ঞানী ডঃ বাসুর দিকে চেয়ে একথা তারা যেন ভাবতেই পারে না।

সুমিত্রা বলল, কোন ডুবো আগ্নেয়গিরির বিস্ফারণও তো ঘটতে পারে ডঃ বাসু? কে জানে, পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের দিক থেকে সাগরের নীচে দিয়ে কোন পর্বতমালা হয়তো নীরবে আন্দামান সাগরের দিকে এগিয়ে এসেছে, হয়ত তারই কোন এক অংশে বিস্ফোরণ ঘটে থাকবে?

ডঃ বাসু বললেন, জানি না। যদি তেমন কিছু ঘটে, একাধ ঘণ্টার মধ্যে নিশ্চয় তার খবর আমরা জানতে পারব। কারণ, সমুদ্রের গভীরে যদি আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে—বুঝতে পার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে? সে ক্ষেত্রে ওই অঞ্চলের সমুদ্র যে কী দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়ে

উঠবে আমি ভাবতেই পারি না। আশ পাশের দ্বীপ ডুববে, ঝড় উঠবে, জাহাজ ভেসে যাবে— !

না। এক ঘণ্টা কেন, পর পর তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পরও তেমন কোন সংবাদ শোনা গেল না। পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অথবা আন্দামান এবং নিকবর দ্বীপপুঞ্জের কোন জায়গা থেকে কেউই জানালো না, সমুদ্রের বুকে হঠাৎ জলোচ্ছাস দেখা দিয়েছে। অথবা জলের ওপরকার কোন দ্বীপ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'ডঃ বাসু বললেন আমরা কোন ভুল করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না, সুমিত্রা। প্রচণ্ড একটা শক ওয়েভ পৃথিবীর ভূ-স্তরের মধ্যে দিয়ে সর্বত্র যে ছড়িয়ে পড়েছে, সে তো আমাদের যন্ত্রই জানিয়ে দিয়েছে। অথচ— !

—জানি না। এ ধরণের ব্যাপার কখনও ঘটতে পারে বলে আমি তো ভাবতেই পারি না, ডঃ বাসু ? কথা বলল সুমিত্রা।

সকাল দশটা নাগাদ ডঃ বাসুর জরুরী আমন্ত্রণে ছোট্ট একটি কনফারেন্সে বসলো। এতে উপস্থিত হলেন প্রবীণ ভূ-বিজ্ঞানী ডঃ রামচন্দ্রন, আবহাওয়া বিশারদ ডঃ মিত্র এবং জন চার বিজ্ঞানী। এবং অবশ্যই ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা।

ডঃ বাসু বললন, ব্যাপারটা এই ভাবে ধরা পড়ে, ভদ্রমহোদয়গণ। তিনি রাত একটার পর থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, একে একে বলে গেলেন। একথাও বললেন, বাঙ্গালোরে পৃথিবীতে যে কয়টি শক্তিশালী ভূ-কম্পন মাপক কেন্দ্র রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম। সেই জন্যে, এরই মধ্যে বেশ কয়টি মান-মন্দির আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওদেরও চক্ষু চড়ক গাছ! ইদানীংকালে এত বড় ভূ-কম্পন আর কখনও ঘটে নি। ওদের সবারই ধারণা, ভূ-কম্পন জ্ঞাপক যন্ত্রগুলি বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়ে থাকবে। তাই নিজেরা ভুল করছে কি-না, সেটা যাচাই করে নেওয়ার জন্যেই ভোর থেকে প্রচুর লং ডিসট্যান্স কল পেয়েছি।

—আরও একটি কারণ অবশ্য আছে, ডঃ বাসু। এ ব্যাপারে আমার মতামতেরও তো এখন একটা দাম আছে। গত দু-বছর ধরে ভূ-কম্পনের উৎস সম্পর্কে যে সব মৌলিক গবেষণা আপনি করেছেন, —মানে আপনি কী বলেন তার ওপরও অনেকে নির্ভর করেছেন বোধহয়। কতকটা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে কথা বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

বলতে কী, ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ বাসুর আন্তর্জাতিক খ্যাতিতে সবাই গর্বিত। এমন একটি ঘটনায় তাঁর মুখ্য ভূমিকার কথা পৃথিবীর কেউই এখন আর অস্বীকার করতে পারেন না।

ডঃ মিত্র বললেন, ব্যাপারটা আমার কাছেও খুব অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে, ডঃ বাসু। আজ সকালে আপনার টেলিফোন পেয়ে আমি আবহাওয়া অফিসে ছুটে গিয়েছিলাম। সকালের দিকে ডিউটি অফিসার ছিলেন মীর্জা। মীর্জার কাছে গিয়ে-গত বারো ঘণ্টার ডেটা পরীক্ষা করে দেখছি, কিন্তু ওই সময়ে বাতাসের চাপে ব্যতিক্রম ধরা পড়ে নি। যদি কোন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের দরুণ এমন ভূ-কম্পন ঘটত তাহলে সারা পৃথিবীর বাতাসের চাপে একটা পরিবর্তন দেখা যেত? অথবা— ?

—বলুন, অথবা আর কী হতে পারে? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

—বাতাসে, অর্থাৎ ঊর্দ্ধাকাশে যদি কেউ পারমাণবিক বোমা ফাটায় সে ক্ষেত্রেও বাতাসের চাপে পরিবর্তন দেখা যায়।

—পারমাণবিক বোমা?

চমকে উঠলেন ডঃ বাসু। না, বাতাসে পারমাণবিক বোমা কেউ ফাটায় নি। ফাটালে, ডঃ মিত্র যা বলেছেন, বাতাসের চাপে নিশ্চয় নাচন শুরু হোত। কিন্তু তা হয় নি। তাহলে কী— ?

মুহূর্তের জন্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন ডঃ বাসু। চকিতে একজনের মুখ তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। তাহলে কি?

না-না। তা কেমন করে হয়। খানিকটা নিজেকে সামলে নিয়ে ডঃ বাসু প্রসঙ্গ পালটে নেয়ার চেষ্টা করলেন।

ব্যাপারটা কেউ হয়ত লক্ষ্য করল না। একজন ছাড়া। সে সুমিত্রা। নিশ্চুপ সে ডঃ বাসুর পাশে বসে। হয়ত মুহূর্তের জন্যে সে চমকেও উঠেছিল।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, শেষ পর্যন্ত তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কী দাঁড়াল ডঃ বাসু ?

ডাঃ বাসু কী যেন ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, সিদ্ধান্ত এখন কিছুই করার নেই। আমাদের আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সম্ভব হলে, দয়া করে আপনি আমাদের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ডঃ রামচন্দ্রন। গ্রেট চ্যানেল এবং আন্দামান সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আকাশ থেকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। দেখা দরকার সেখানকার সমুদ্রে কোন রকম আলোড়ন দেখা দিয়েছে কী-না। অথবা কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে কী না।

জরুরী কনফারেন্স। আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

ওঁরা সবাই চলে গেল, সুমিত্রা বলল, এবার আপনি কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম করে নিন, ডঃ বাসু। কাল রাত থেকে ধকল তো আপনার কম গেল না ?

মৃদু হাসল ডঃ বাসু। সত্যি তো। গত কয়েক ঘণ্টা যন্ত্রের মত কাজ করে গেছেন তিনি। ভুলেই গিয়েছিলেন, তিনি একটা মানুষ। মানবিক কোন অনুভূতি তার মধ্যে আছে। সুমিত্রার কথায় সেই অনুভূতিটুকু তিনি ফিরে পেলেন।

ধকল তো তোমার ওপর দিয়েও গেছে সুমিত্রা! ডঃ বাসুর কণ্ঠে স্নেহপ্রবণ সুর।

সুমিত্রার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। মৃদু অভিব্যক্তি কিন্তু পরিপূর্ণ অর্থবহ।

আমিও বিশ্রাম নেব। কথা বলল সুমিত্রা।

একবার সে ভাবল, ডঃ মিত্রের কথা শুনে হঠাৎ অমনভাবে ডঃ বাসু চমকে উঠেছিলেন কেন—জিজ্ঞেস করে। কিন্তু করল না।

অহেতুক সে পছন্দ করে না। প্রচণ্ড চাপা স্বভাব সুমিত্রার।

ডঃ বাসু তা বুঝতে পেরেছেন সামান্য কয়েক দিনের পরিচয়েই। এটাও বুঝতে পেরেছেন, বাইরের আবরণের ভেতরে যে সুমিত্রা, সে সুমিত্রা হৃদয়ে অনেক বড় মমতাময়ী। অব্যক্ত। শুধু অনুভূতিতে ধরা পড়ে।

বরং সেই ভাল। বেলা হয়ে গেল হস্টেলে গিয়ে স্নানটান সেরে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করে নিই। তারপর দেখা যাক, বিকেলের দিকে কোন খবর আসে কী না। চল তোমাকেও তোমার হস্টেলে পৌঁছে দিই।

ডঃ বাসু নিচে নেমে গাড়ি বের করলেন। ডিউটি অফিসারকে বলে গেলেন, কোন রকম জরুরী খবর থাকলে তিনি যেন তার হস্টেলে জানিয়ে দেন।

সুমিত্রা বসল পাশে। ডঃ বাসু ড্রাইভ করছেন। হস্টেল মিনিট দশেকের পথ। পথে কারোর মুখে কোন কথা নেই। মনে হল ডঃ বাসু হঠাৎ যেন অনেক গম্ভীর হয়ে গেছেন।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গাড়ি এসে থামল সুমিত্রার হস্টেলের পাশে। ডঃ বাসু নেমে দরজা খুলে দিলেন। সুমিত্রা নামল। ডঃ বাসু দরজা বন্ধ করলেন।

এখন চলি, কেমন ? বললেন ডঃ বাসু।

সুমিত্রা মৃদু হেসে পা বাড়াল।—বলল, সাবধানে ড্রাইভ করবেন। এখন আপনি বড় অন্যমনস্ক।

ডঃ বাসু মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই হস্টেলে পৌঁছলেন। আর সারা পথ একটি চিন্তাই তাকে সমাহিত রাখল। সুমিত্রা ধরেছে ঠিকই। সত্যিই তিনি অন্যমনস্ক। শুধু এই মুহূর্তে নয়। ডঃ মিত্রের মুখে পরমাণু বোমার নাম শোনার পর থেকেই। একটা মাত্র চিন্তা তারপর থেকেই কেমন যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এতক্ষণ ধরে অনেক কথা বললেও সেই একই চিন্তা! যেন চিন্তা রাক্ষস।

তাঁকে গ্রাস করছে ধীরে ধীরে।

হস্টেলে ফিরে গরম জল দিয়ে চান করলেন তিনি। ক্যানটিনকে বললেন, তাঁর খাবার যেন তাঁর ঘরেই দিয়ে যায়। ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার আর ইচ্ছে হল না ডঃ বাসুর।

স্নানটান সারতে ঘণ্টাখানেক লাগল। এখন খানিক ফ্রেস মনে হল যেন। হাল্কা একটা পাজামা এবং গেঞ্জী পরে গায়ে খানিক ওলড স্পাইস ছড়িয়ে নিলেন। এ পাউডারটিকে তাঁর ভাল লাগে। এর মৃদু গন্ধের মধ্যে অপূর্ব এক স্নিগ্ধতা।

সোফায় বসলেন।

আজকের খবরের কাগজগুলি একবার দেখা দরকার।

পর পর সবক'টি কাগজের পাতা উল্টে গেলেন তিনি। ইনডিয়ান একসপ্রেস এবং টাইমস অফ্ ইনডিয়ায় খবরটি দেখছি ছাপা হয়েছে। মৃদু এবং আত্মগতভাবে কথা বললেন ডঃ বাসু। মাত্র লাইন আটেকের মধ্যেই সমস্ত বক্তব্য শেষ। প্রচণ্ড ভূমিকম্প ধরা পড়েছে। সম্ভবতঃ গ্রেট চ্যানেলের কোথায়। এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোন বিবরণ শোনা যায় নি। ব্যস এর বেশি কিছু নয়।

অন্যমনস্ক হলেন ডঃ বাসু। কী ভাবলেন। তারপর টেলিফোন রিসিভারটি তুলে নিলেন। কথা বললেন, এ লং ডিসট্যান্স কল প্লিজ। ভায়া স্যাটেলাইট।

ওপার থেকে অপারেটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ইয়েস স্যার নাম্বার প্লিজ!

—৫৭৩৪৫

—ডঃ বাসু কথা বলছেন? অপারেটার।

—আমি ডঃ বসু কথা বলছি।

—বলুন স্যার, কত নম্বর চান। আজ সকাল থেকে তো আপনার লাইন দারুণ ব্যস্ত।

—জি. আর—৪৫৬২৩, ইউ এস এ

—থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আমি এক্ষুনি দিচ্ছি।

ডঃ বাসু রিসিভার নামিয়ে রেখে কফির কাপে চুমুক দিলেন। মনে হল সেই সঙ্গে একটু অন্যমনস্কও হলেন যেন। তাঁর মনের মধ্যে উজ্জ্বল একটি মুখ ভেসে উঠল। বছর পাঁচ আগেকার ছবি। হ্যাঁ। লোকটি কী সাংঘাতিক ধরণেরই না চটপটে। সেই সঙ্গে যত সব উদ্ভট্ কল্পনা তাঁর মাথার মধ্যে। মনে পড়ে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনার কথা একবার তিনি তাঁকে শুনিয়েছিলেন। এক সন্ধ্যায়। ডিনার খেতে খেতে কথাগুলি শুনছিলেন। উত্তর দেন নি। কারণ সে সব তখন ডঃ বাসুর কাছে পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হয়েছিল। তিনি কিন্তু যথেষ্ট সিরিয়াস। মনে পড়ে শেষের দিকে তিনি যেন বলেছিলেন, এ ছাড়া কোন উপায় নেই, মিঃ বাসু। পৃথিবীটাকে যদি বাঁচাতে হয়—মানে পৃথিবীর এই মানব সভ্যতাকে—তাহলে এটাই একমাত্র পথ। সায়ান্স ফিকশনের মত মনে হচ্ছে, তাই না ? আমার কিন্তু মনে হয়, আমি পারব। ডঃ বাসু তখন মিস্টার বাসু। কারণ তখনও তিনি তাঁর ডক্টরেট উপাধী পান নি।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং······

জোরে টেলিফোন কল বেজে উঠল।

মুহূর্তে কম্পিত হাতে টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিলেন ডঃ বাসু।

—ইয়েস—

—জি আর—৪৫৬২৩, অস্টিন, টেকসাস, স্যার।

—ইয়েস

—ইউনিভার্সিটি অফ্ টেকসাস। দিস ইজ ডঃ ব্রেকম্যান স্পিকিং। ডিপার্টমেন্ট অফ্ জিওফিজিকস্— ! ওপার থেকে গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—গুড মর্ণিং ডঃ ব্রেকম্যান। আমি ইনডিয়া থেকে ডঃ বাসু কথা বলছি।

—গুড আফটারনুন। হাউ ডুই—ড্যু—! এখন তোমাদের ওখানে ছুপুর। আমার ঘড়িতে এখন রাত দশটার মত। তাই গুড মর্ণিং আর বলতে পারছি না। ছঃখিত।

—ফায়েন। আপনাকে ব্যস্ত করছি, ডঃ ব্রেকম্যান। রসিকতার সুযোগ পেলে উনি ছাড়েন না।

—ও—নো। বলে যাও।

—ডঃ অ্যাণ্টেনিওডিচ্ এখন কোথায় ?

—ত্য সেম কোশ্চেন টু ইউ, স্যার-র! আমরাও তো তাঁকে খুঁজছি। বছর তিনেক হল তিনি তো এই ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চলে গেছেন। পাগলাটে লোক—অফকোর্স এ জিনিয়াস—কোন এক জায়গায় স্থির থাকেন না। কী ব্যাপার বলতো ? তোমার এই কলের ঘণ্টা ছুই আগে জেনিভা থেকে ডঃ ফ্লেমিংও ওঁর খবর জানার জন্যে টেলিফোন করেছিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সিকিউরিটি কাউনসিলের ডঃ ফ্লেমিং-এর কথা বলছি।

তা হলে যুক্তরাষ্ট্রে এখন তিনি নেই, এই তো ?

—না থাকাটাই তো স্বাভাবিক। থাকলে কী আর তাঁর হদিস মেলা শক্ত হোত ?

—ঠিক কথা। ডঃ বাসু খানিকটা আত্মমগ্ন হলেন।

ডঃ ব্রেকম্যান আরও কথা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু সংক্ষিপ্ত একটা 'ধন্যবাদ' জানিয়ে লাইন কেটে দিলেন তিনি। কাজটা খানিকটা অসৌজন্যের মত দেখাল হয়ত। রিসিভার নামিয়ে রেখে একথা যে ডঃ বাসুর মনে হয় নি তাও নয়। কিন্তু সে সব ভাবনা এখন থাক।

কফির পেয়ালা একপাশে সরিয়ে রেখে ডঃ বাসু আবার রিসিভার তুলে নিলেন।

ইয়েস স্যার? ওপার থেকে কথা ভেসে এল। কথা বলল ক্যানটিন ম্যানেজার নাগরাজন।

আমি ডঃ বাসু বলছি। কে, নাগরাজন ? —শোন। আমি

অল্পক্ষণের মধ্যেই বেরোব। আমার খাবারটা যদি এখুনি আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে ভাই, ভাল হোত।

—এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, ডঃ বাসু।

—ধন্যবাদ।

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডঃ বাসু।

পরিষ্কার মনে হল তিনি এরই মধ্যে কেমন যেন বেশি রকমের অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছেন।

একটা মুখ। পাঁচ বছর আগে। মনে পড়ে, লোকটির কথা সেই তিনি প্রথম শুনেছিলেন। তার দু বছর পর অস্টিনে টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিয়েছিলেন ডঃ ব্রেকম্যান স্বয়ং।

এখনও সে দিনটির কথা ভুলতে পারেন নি তিনি। বিকেল পাঁচটায় মহাকাশ গবেষণা সংক্রান্ত একটি আলোচনা সেরে ডঃ ব্রেকম্যান এবং তিনি সান্ধ্যভোজন শেষ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাফেটেরিয়ায় যখন গিয়ে বসেছিলেন, সেখানে তখন তেমন কোন ভিড় ছিল না। সেটা এপ্রিল মাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরের বার্চ গাছগুলি নতুন সবুজ পাতায় ঢেকে গেছে। কাফেটিরিয়ার পেছন দিকের উঁচু জমকালো গ্রন্থাগারের ওপর এসে পড়েছে পড়ন্ত রোদের ছায়া। টাওয়ারটার সারা মাথা লাল আলোয় জ্বল জ্বল করছে। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুটবল দল—যাদের পরিচিতি লং হর্ন—হিউসটনের সঙ্গে ম্যাচে জিতেছে। লাল আলোর সমাহার সেই বিজয় বার্তারই নির্দেশিকা। একটা করে চিজবার্গার, চারকোল রোস্টেড বিফ এবং আইসক্রিমের কাপ নিয়ে সামনাসামনি বসে তাঁরা ভোজনপর্ব সারছিলেন। এমন সময় সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই লোকটি। হয়ত কোথাও যাচ্ছিলেন। সামনে পড়ে গেলেন এই যা।

হ্যাল-লো! বলেই লাফিয়ে উঠেছিলেন ডঃ ব্রেকম্যান। তারপর ডঃ বাসুর দিকে চেয়ে বলেছিলেন, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন ডঃ নিগুচি, ডঃ বাসু।

হাউ ডু ইউ ডু? বললেন ডঃ বাসু।

হাউ ডু ইউ ডু! মৃদু কণ্ঠে অভিবাদন জানালেন ডঃ নিগুচি। এক কাপ কফি নিশ্চয় চলতে পারে, ডঃ নিগুচি— ? ডঃ ব্রেকম্যান ডঃ নিগুচিকে আমন্ত্রণ জানালেন।

—ধন্যবাদ ডঃ ব্রেকম্যান। আপনাদের সঙ্গে বসে এক কাপ কফি খেলে খুব আনন্দিত হতাম। কিন্তু এখন একটা জরুরী কাজ আছে বলে আর বসতে পারছি না। আশা করি মাফ করবেন। ডঃ নিগুচি কথা বললেন।

—না, না। তা কেন। ঠিক আছে, পরে একবার হবে এখন। ডঃ ব্রেকম্যান।

—ধন্যবাদ। আচ্ছা, চলি এখন ডঃ বাসু, ডঃ ব্রেকম্যান। বাই!

শান্ত পদক্ষেপে নিগুচি চলে গেলেন।

ডঃ ব্রেকম্যান এবং ডঃ বাসু যতক্ষণ না নিগুচি সুইং ডোরটি ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যান, ততক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। নিগুচির ধীর পদক্ষেপের মধ্যে ছিল কেমন যেন একটা শান্ত এবং দৃঢ়তার অভিব্যক্তি। যা প্রথম নজরে সবারই চোখে পড়ে। বয়েস বছর চল্লিশ। তবে চেহারায় খানিকটা প্রবীনত্বের ছাপ।

—পাগল। নিগুচি অদৃশ্য হওয়ার পর কথা বললেন ডঃ ব্রেকম্যান। —ওঁর মাথার মধ্যে যে কত রকমের উদ্ভট কল্পনা থাকতে পারে, ওঁর সঙ্গে কথা বললেই তুমি বুঝতে পারবে। এতদিন সমুদ্র বিজ্ঞান নিয়ে কী সব পরিকল্পনা করছিলেন। এখন ভূমিকম্প নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন।

—মজার ব্যাপার তো? বললেন ডঃ বাসু।

—কথা বলেন খুব কম। তবে হৃদয়টা খুব দরাজ। ডঃ ব্রেকম্যানের মন্তব্য।

—কথা কম বলাটা জাপানীদের ধর্ম। তবে দরাজ হৃদয়ের ব্যাপারটা ব্যতিক্রম।

—বলতে পার। তবে একদিন ভালভাবে আলাপ করে দেখো, তুমি নিজেই বুঝতে পারবে আমি সত্যি বলছি কী না।

এর পর দু একটি টুকিটাকি কথা বলার মধ্যে দিয়ে ওঁদের খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছিল। ডঃ ব্রেকম্যান তারপরই চলে যান। ডঃ বাসু বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে রিও-গ্র্যাণ্ডের পথে পা বাড়ালেন। সান অ্যান্টোনিওর রাস্তা ঘুরে রিওগ্র্যাণ্ডের মুখে পড়তেই দেখা সমর মুখার্জির সঙ্গে। ছেলেটি তখন নতুন এসেছে। ডঃ নিগুচির কাছে ভূ-বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছিল। বছর তেইশ বয়েস।

কৌতূহলী হলেন ডঃ বাসু।

—কেমন আছ? তোমার মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে পরিচয় হোল আজ। বললেন ডঃ বাসু।

—কে? ডঃ নিগুচি?

—হ্যাঁ বেশ ভাল লাগল ভদ্রলোককে।

ডঃ বাসুর কথায় সমর একটু চমকে উঠেছিল। মনে হল হঠাৎ সে যেন জোর করেই নিজেকে বোবা বানিয়ে তুলতে চায়

কথা বলেন কম, তা ছাড়া এখন কিছুটা ব্যস্তও। সংক্ষেপে উত্তর দিল সমর।

—কি নিয়ে কাজ করছেন?

—কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না।

পরিষ্কার বোঝা গেল সমর জানে সবই। কিন্তু বলতে চায় না।

টুকিটাকি কথা বলতে বলতে ওঁরা এসে পড়লেন সিটন হাসপাতালের কাছ বরাবর। এখান থেকেই শুরু হয়েছে আঠারো নম্বর—পশ্চিম রাস্তা। এ রাস্তা ঢালু হয়ে নেমে গেছে লামারের দিকে। লামার বুলেভার। তার ওপারে কলোরেডো নদীর ছোট্ট একটি খাল। সমরের অ্যাপার্টমেণ্ট ওই দিকে। সে চলে গেল। ডঃ বাসু সোজা চলে এলেন তাঁর নিজের ড. স্তানায়। সান্তারিতায়।

এর দুদিন পর নিগুচির সঙ্গে আবার দেখা কাফেটেরিয়ায়।

হ্যালো—! কথা বলেছিলেন ডঃ বাসু।

হ্যালো। অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা দুলিয়ে নিজের টেবিলে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ডঃ নিগুচি।

সেদিন খানিকটা ঘনিষ্ঠতা বাড়ল।

অবশেষে আরও ঘনিষ্ঠ। মাঝে মাঝে দেখা হোত ডঃ নিগুচির সঙ্গে ডঃ বাসুর। যখন দেখা হোত, তখন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ সময়ই কথাবার্তা হোত পৃথিবীর ভূস্তর, ভূকম্পনের উৎপত্তি, অথবা আবহাওয়ামণ্ডলের গতি প্রকৃতি নিয়ে। কখনও বা কল্পনার জাল বুনে সুদূর এক কল্পলোকে চলে যেতেন ডঃ নিগুচি। তখন মনে হোত এ জগৎ থেকে তিনি যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চান।

একদিন কথার ফাঁকে ডঃ নিগুচি বললেন, পৃথিবীটা কেমন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই না ডঃ বাসু?

কী রকম? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

না, মানে, যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, সীমিত, সীমিত সম্ভার নিয়ে বলুন, আর কতদিন চলতে পারে?

অদ্ভুত মনে হয়েছিল সেদিন ডঃ বাসুর। কোথা থেকে কী কথা এসে পড়ল। জলহাওয়া, পৃথিবীর ভূ-কম্পন, তার সঙ্গে জন সংখ্যার বৃদ্ধি—এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কটা যে ঠিক কোনখানে, সেটা যেন বোঝা গেল না।

—বলছিলাম আর কি, বলে যেতে লাগলেন ডঃ নিগুচি।—এ সব ভাবতে গিয়ে আপনার কাছে মাঝে মাঝে কেমন মনে হয় না?

—ঠিক কী আপনি বলতে চাইছেন, আমি বুঝে উঠতে পারছি না, ডঃ নিগুচি। ডঃ বাসু।

—বলছিলাম, এ পৃথিবীতে মানুষই তো একমাত্র প্রাণী নয়? বাঘ, ভালুক, সাপ—কত রকমের পাখি, মাছ, পোকামাকড়, হাজারো জন্তু জানোয়ার। এরাও তো প্রাণী? কিন্তু দেখুন, প্রকৃতির কি

অদ্ভুত নিয়ম। জনস্ফীতি মানুষের মধ্যে যে ভাবে ঘটেছে, তেমন তো ওদের মধ্যেও ঘটতে পারত? আজ থেকে একশ' বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা ছিল কত কম। সেই সংখ্যাটি বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে চারশ' কোটিতে। বাঘেরা এই ভাবে যদি বংশ বৃদ্ধি করতে পারত—পৃথিবীতে শুধু বাঘের সংখ্যাই কত কোটি দাঁড়াত, বলুন দেখি? বলবেন, মানুষ বাঘকে খুন করে, তাই তারা বাড়তে পারে না। কিন্তু আরও অনেক রকম প্রাণীও তো আছে, যাদের মানুষ খুন করে না। তাদের সংখ্যা বাড়ে নি কেন? আসল কথা অন্যসব প্রাণীর মধ্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই যেন একটা ভারসাম্য বজায় থাকছে। একমাত্র মানুষের বেলাতেই তার ব্যতিক্রম—তাই না? যদি এ ভাবে চলতে থাকে—!

কী বলতে চান ডঃ নিগুচি?

মনে হোল ডঃ নিগুচি যেন স্বপ্নবিলাসী। সেদিন একান্তে কত রকমের কথাই তিনি বললেন ডঃ বাসুর কাছে। তার সমস্তটাই অবাস্তব কল্পকাহিনীর মতই মনে হয়েছিল।

এর কয়েকদিন পর ডঃ ব্রেকম্যান কী একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ডঃ বাসু, নিগুচির এবার মাথা খারাপ হতে শুরু করেছে। সমুদ্র নিয়ে উনি এত ক্ষেপে উঠলেন কেন বলতো?

—কেন, আবার কী তিনি করলেন? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

—এখন ভূকম্পন ছেড়ে সারা পৃথিবীর সমুদ্র নিয়ে ক্ষেপে উঠেছেন। পাগলাটা কী পরিমাণ কল্পনা করতে পারেন, দেখ একবার?

ডঃ ব্রেকম্যান একটা খাতা খুলে ধরলেন ডঃ বাসুর সামনে। ডঃ নিগুচির ব্যক্তিগত পরিকল্পনা।

কয়েকটি পাতা মাত্র। চোখ বোলাতে ডঃ বাসুর তেমন কোন সময় লাগে নি। পড়া শেষ হওয়ার পর বিস্ময়ে কথা বলতে পারেন নি তিনি।

—এ সব বিশ্বাস করতে পার ? ডঃ ব্রেকম্যানের প্রশ্ন।

—তা হলে এসব নিয়েই এখন তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন ?

—পাগলামী। স্রেফ পাগলামী। কখনও এ সব করা যায় নাকি ?

—খাতাটা পেলেন কোথায় ?

—আমার ডেস্কের ওপর। ডঃ নিগুচি আজ সকালে আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন পারমাণবিক বিস্ফোরণ সংক্রান্ত কয়েকটি তথ্য নিয়ে আলোচনা করতে। হয়ত সেই সময় ভুলে ফেলে গেছেন। আমার এক ছাত্র জিম খাতাটি পেয়েছিল। সে-ই প্রথমে পড়ে। তারপর এক চোট হেসে খাতাটি সে দেয় ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচকে ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ খাতাটি আমাকে দিয়েছেন। কী মনে হচ্ছে তোমার ? পাগলামী না ?

ডঃ ব্রেকম্যান সেদিনই ডঃ নিগুচিকে খাতাটি ফেরত দিয়েছিলেন।

পরদিন সমরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ডঃ বাসুর। দেখা হতেই তাকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, ড নিগুচি কী সব ভাবছেন ?

সমর হঠাৎ এই প্রশ্নে গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

এর দিন পনের পর শোনা গেল ডঃ নিগুচি টেকসাস ছেড়ে চলে গেছেন। সেই সঙ্গে সমরও। ঠিক কোথায় গেছেন কেউ বলতে পারেন না। ডঃ বাসুও তখনকার মত তাঁর কথা নিয়ে তেমন মাথা ঘামানোর কথা ভাবতে পারেন নি।

ক্যানটিন থেকে খাবার দিয়ে গেল।

পুরোনো চিন্তাসূত্রটি সেই সঙ্গে কেটে গেল ডঃ বাসুর। তাঁর মনে হল এতক্ষণ তিনিও আবোল তাবোল কী সব ভেবে চলছিলেন।

না, না। এতটা কী করে সম্ভব ? এসব তাঁর উদ্ভট কল্পনা। তবু কেন যেন, সেই মুহূর্তের ডঃ নিগুচির কথাটা ভোলা যায় না। ডঃ ব্রেকম্যান বললেন, তাঁর কথা ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচকে জিজ্ঞাসা

করেছেন। তা হলে কি— ?

আধঘণ্টার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে সোফার ওপর একটু গা এলিয়ে দিলেন ডঃ বাসু। এ তাঁর পুরণো অভ্যাস। খাওয়ার পর আধ ঘণ্টার মত বিশ্রাম না করলে তাঁর ভাল লাগে না। এর মধ্যে ক্যানটিনের ছেলেটি এসে বাসন কোসন নিয়ে গেল।

মিনিট কুড়ি বিরতি।

ডঃ বাসুর কাছে মনে হোল কুড়ি মিনিট নয়। যেন কুড়িটি বছর। এক রাতের সেই ভূ-কম্পনের সংকেতের ব্যাপারটা তাঁর এত দিনের চিন্তাভাবনাকে যেন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। তিনি ভাবতেই পারছেন না, এত বড় ভূ-কম্পন হয়ে গেল, অথচ এখনও পর্যন্ত সাংঘাতিক কোন দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেল না—কী করে এটা সম্ভব ? সমুদ্রের গভীরে তেমন কিছু ঘটলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস হত। দু চারটে দ্বীপ অথবা মূল ভূখণ্ডের কোন কোন অংশে তাতে ক'রে প্লাবন হওয়ার কথা। তেমন কিছু ঘটলে সংবাদ পাওয়া যেত। কিন্তু পাওয়া যায় নি। যদি স্থলভাগের কোন পাহাড় ভেঙ্গে পড়ত, তাহলে—তেমন কোন ঘটনার পরিণতি ভাবতে গেলেও যেন গা শিউরে ওঠে।

তাহলে কি ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ? কোন দেশের পক্ষে তেমন কাজ গোপনে করা এমন কোন অবাস্তব কল্পনা নয়। বিশেষ করে আজকের পৃথিবীতে প্রবঞ্চনা, লুকোচুরি—এসব তো নৈমিত্তিক ব্যাপার। পৃথিবীর সব দেশই মুখে বন্ধুত্বের কথা বলে এক হাতে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করছে, আর এক হাতে ছোরা নিয়ে পিঠের ওপর উঁচিয়ে রয়েছে। মুখে বলছে পারমাণবিক যন্ত্র তৈরী করা অন্যায়। এ কাজ বন্ধ করা দরকার। কিন্তু যার ক্ষমতা আছে সে কি এ সব কথা মেনে চলছে ? আসলে এটা যেন ক্ষমতার যুগ। যার ক্ষমতা আছে মানবিক সংগা অথবা সভ্যতার দোহাই দিয়ে যাবতীয় কাজ কর্ম সে নিজের মত করেই গড়ে নেয়।

ডঃ বাসুর চিন্তা ক্রমেই জট পাকাচ্ছে যেন। আর সেই জটের

মধ্যে, কেন, তিনি নিজেও যেন বুঝতে পারছেন না, একটি মুখ বার বার তাঁর মনের পর্দায় ফুটে উঠছে। সে মুখ ডঃ নিগুচির।

টেলিফোন বেজে উঠল।

—ইয়েস? কথা বললেন ডঃ বাসু।

—খবর শুনেছেন ডঃ বাসু? মানে—না। আচ্ছা থাক। আমি নিজেই আসছি। কথা বলল সুমিত্রা। সুমিত্রার কণ্ঠে উদ্বেগ।

কী খবর, সুমিত্রা? আবার কি কোন নাটকীয় খবর এসেছে?

—মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করুন, বরং এসেই আপনাকে বলছি সব। বলেই টেলিফোনের সংযোগ কেটে দিল সুমিত্রা।

বিস্মিত হলেন ডঃ বাসু। বুঝলেন, নিশ্চয় এমন কিছু ঘটেছে, যা সুমিত্রা টেলিফোনে তাঁকে বলতে চায় না। কিন্তু এই ঘণ্টা দুই এর মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে?

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পৌঁছলো সুমিত্রা। মনে হল এর মধ্যে তার চেহারাটাই পালটে গেছে।

ডঃ বাসুর ঘরে ঢুকে সে ধপ করে একটি সোফায় বসে পড়ল।

— কী ব্যাপার, সুমিত্রা? তোমাকে খুবই উত্তেজিত দেখাচ্ছে। দাঁড়াও এক মিনিট থেমে নাও। তারপর শুনছি। তার আগে একটু সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও দেখি।

—না, না। আমি ঠিক আছি, ডঃ বাসু। সুমিত্রা বাধা দিল।

ডঃ বাসু ফ্রিজ থেকে অরেঞ্জ স্কোয়াশ বের করে এক গ্লাশ সরবৎ তৈরি করে সুমিত্রাকে দিলেন।

—ধন্যবাদ, ডঃ বাসু।

সুমিত্রা সরবৎ খেল। ওর খাওয়ার ধরণ দেখে ডঃ বাসুর বুঝতে অসুবিধে হয় নি ব্যাচারার সত্যিই খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

সরবৎ শেষ করার পর আর অপেক্ষা না করে কথা বলল সুমিত্রা।

—একটা দারুন খবর এসেছে, ডঃ বাসু?

—কী ব্যাপার ? এবার ডঃ বাসুও উদ্বিগ্ন হলেন।

—আপনি তো চলে এলেন আমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে হোস্টেলে পৌঁছোতেই দোর গোড়ায় পা দিয়েছি এমন সময় জরুরী টেলিফোন কল পেলাম আমাদের সাইসমোগ্রাফ সেণ্টার থেকে। ডঃ রামচন্দ্রন টেলিফোন করছেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন —সুমিত্রা, ডঃ বাসু কি এখনো তোমার ওখানে আছেন ? আমি বললাম, কেন বলুন তো ? আমাকে পৌঁছে দিয়ে এখুনি তিনি নিজের হস্টেলে চলে গেলেন। ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, খুব জরুরী ব্যাপার।—তাহলে হস্টেলেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি বরং। আমি বাধা দিয়ে বললাম, ডঃ বাসু গতকাল সারা রাত একটানা কাজ করার ফলে এখন খুবই ক্লান্ত। একাধ ঘণ্টা ওঁর বিশ্রামের দরকার। আপনি বরং আমাকে বলুন না ? ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, তাও তো ঠিক। আচ্ছা, তিনি বরং বিশ্রাম করুন : তুমি এখুনি একবার সেণ্টারে আসতে পার ? আমি বললাম, আসছি !

ডঃ বাসু সুমিত্রার দিকে চাইলেন। তাঁর ব্যাপারে তার নজর যে কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না, এ কয়েক মাসেই তিনি তা লক্ষ্য করেছেন। ব্যাচারা। এত খুঁটিনাটিও সে দেখে ? সত্যি। গতকাল রাতে একটানা কাজ করার পর সত্যিই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বিশ্রামের দরকার ছিল।

কিন্তু তা না হয় হোল। সুমিত্রার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত তার খাওয়া হয় নি।

—বুঝতে পাচ্ছি, এখনও তুমি কিছু খাওনি। আগে খেয়ে নাও, তারপর সব শুনব।

—না, না। আমি ঠিক আছি। আগে আপনি আমার কথা শুনুন। ব্যাপারটা খুব জরুরী। বাধা দিল সুমিত্রা।

ডঃ বাসু তার এ কথায় থামলেন না। ক্যানটিনে খাবারের জন্যে অর্ডার দিলেন।

হ্যাঁ। এটা তাঁর আর একটি বড় রকমের বৈশিষ্ট্য। খুব জরুরী কাজের সময় নিজের কৌতূহলকে তিনি অস্বাভাবিকভাবে সংযত রাখতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন, গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু নিশ্চয় ঘটেছে। কিন্তু তার চাইতেও বড়। সুমিত্রা এখনও অভুক্ত। সে-ও তো তাঁর সঙ্গে গত কাল সারা রাত জেগেছে? কিছু পেটে না পড়লে, সে-ও তো অসুস্থ হয়ে পড়বে। তিনি বুঝতে পেরেছেন, সুমিত্রা যা বলবে, তা শুনে বড় রকমের একটা কাজে নিশ্চয় তাঁকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। অতএব সুমিত্রারও সুস্থ থাকা দরকার।

অদ্ভুত ব্যাপার। কোন কোন মানুষ হঠাৎ করে কেমন যেন দ্রষ্টা হয়ে পড়ে। তখন তাৎক্ষণিক কোন যোগসূত্র তার চিন্তা ভাবনার মধ্যে না থাকলেও অজ্ঞাতসারেই কে যেন বলে দেয়, হ্যাঁ, এমন ঘটনাও সম্ভব, এমনটিও হতে পারে।

ডঃ বাসুর ক্ষেত্রে ঠিক তেমনই একটি ঘটনা ঘটে গেল।

সুমিত্রা বলল, আপনি চলে আসার পরই জেনিভা থেকে ডঃ রামচন্দ্রন একটি সংবাদ পেয়েছেন। পৃথিবীর কোন একটি দেশ নাকি মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

—তাই বল। তার-জন্যেই এমন ভূকম্পন। খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে কথা বললেন ডঃ বাসু।

—আংশিক হয়ত।

—কেন?

—খবরে দেশটির কথা গোপন করা হয়েছে। তবে একথা বলা হয়েছে, যে ধরণের বোমা ফাটান হয়েছে তার ক্ষমতা পঁচিশ কিলোটনের মত হবে।

—সেটা কি করে সম্ভব? তুমি নিজেও তো দেখেছো—আমাদের যন্ত্র যা তথ্য সংগ্রহ করেছে, তাতে, যদি সত্যিই কেউ পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে থাকেও, সেই বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা কোন ক্রমেই

পাঁচশ কিলোটনের কম হতে পারে না ?

—জানি, ডঃ বাসু। সে জন্যেই তো আমার সন্দেহ হচ্ছে।

—তার মানে ? ডঃ বাসুর কণ্ঠে বিস্ময়।

ডঃ রামচন্দ্রন খবরটি দিয়ে বললেন, আমাদের ভূকম্পন জ্ঞাপক যন্ত্রটি হয়ত বিগড়ে গিয়ে থাকবে। সত্যিই পঁচিশ কিলোটনের মত বিস্ফোরণ কেউ হয়তো ঘটিয়ে থাকবে। কিন্তু যন্ত্রটি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ঠিক মত তথ্য যোগাতে পাচ্ছে না।

—অসম্ভব। যন্ত্রটিকে আমি নিজে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি সে তো তুমিও জান, সুমিত্রা।

—জানি। আমারও দৃঢ় ধারণা, ভুল আমরা করি নি। তাই ডঃ রামচন্দ্রনকে আমি বললাম, ডঃ বাসুকে আমি বলছি সব। তিনি এসে দেখুন, সত্যিই গলদটা কোথায় ?

ভাল কথা। কিন্তু তাতে কি এমন এসে যায় ?

সুমিত্রা সঙ্গে করে একটা ফাইল নিয়ে এসেছিল। এবার সে ফাইলটি খুলল। ফাইলের ভেতর থেকে বের করল ছোট্ট একটি চিরকুট। চিরকুটটি সে ডঃ বাসুর দিকে এগিয়ে দিল।

হ্যাঁ। ছোট্ট চিরকুট। তার ওপর লেখা কয়েকটি তারিখ। গত দুই বছরে ওই ওই তারিখে মাটির নিচে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায়। তারিখের পাশে প্রত্যেকটি বোমার বিস্ফোরণ শক্তি কত, লেখা আছে। আর প্রত্যেকটি তারিখের ওপর একটি করে তারকা চিহ্ন বসান হয়েছে।

চিরকুটটির ওপর চোখ বোলানোর পর ডঃ বাসু জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি নিয়ে সুমিত্রার দিকে চাইলেন।

সুমিত্রার মুখে তখন সকৌতুক হাসি।

ডঃ বাসু বললেন, তুমি ঠিক যে কি বলতে চাও, আমি বুঝে উঠতে পারছি না সুমিত্রা।

—এই তারিখগুলির কথা আপনি কি ভুলে গেছেন, ডঃ বাসু ?

মাস দুই আগে এগুলি আপনিই তো আমাকে দিয়ে বলেছিলেন, ওই সব দিনের বিস্ফোরণের ঘটনাগুলি আপনাকে খুবই নাকি বিস্মিত করে তুলেছে। কারণ আন্তর্জাতিক পরমাণু গবেষণা সংস্থা তাদের ইস্তাহারে প্রকাশ করেছিল, যে সব বিস্ফোরণ ওই ওই দিন ঘটান হয়—তাদের সঠিক যে ক্ষমতা তার সঙ্গে বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর বিভিন্ন মানমন্দির থেকে সংগৃহীত ভূকম্পনের মাত্রার নাকি মিল নেই।

—জানি। কথা বললেন ডঃ বাসু। —আন্তর্জাতিক পরমাণু গবেষণা সংস্থার মতে ওই সব তারিখে যে যে বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছিল, তার কোনটিরই মাত্রা পঞ্চাশ কিলোটনের বেশি ছিল না। অথচ, বিস্ফোরণের পর পৃথিবীর প্রায় সবক'টি মানমন্দিরে যে ধরণের কম্পন ধরা পড়ে, তাতে দেখা যায় গবেষণা সংস্থা প্রতিটি বিস্ফোরণের যা যা হিসেব দিয়েছিল, ভূকম্পনের হিসেবের উপর যদি আস্থা রাখতে হয়, তাহলে কেনটিই তার সত্যি ছিল না। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভূকম্পন দেখে মনে হয়েছে, যতখানি বিস্ফোরণের কথা বলা হয়েছে, সে তুলনায় আসল বিস্ফোরণের মাত্রা তিন থেকে চারগুন বেশি। এ নিয়ে বেশ খানিকটা ঝড়ও বয়ে গিয়েছিল। বিস্ফোরণকারী দেশগুলির ওপর অনেকেই অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিল। অনেকের ধারণা হয়েছিল, বিস্ফোরণের মাত্রার কথাটা মিথ্যে বলা হয়েছে। যতটা বিস্ফোরণ ঘটেছে বলে প্রচার করা হয়েছিল, মূল বিস্ফোরণ তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটান হয়। তবে পরে, আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা তদারক করে দেখেছেন। আদপে কেউই মিথ্যে কথা বলেনি। কিন্তু ভূকম্পন বিশেষজ্ঞ হিসেবে, ব্যাপারগুলি আমার কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছে। কারণ ওই পাঁচটি ঘটনাই যা ছিল ব্যতিক্রম। ওই সব ঘটনার আগে, মাঝে অথবা পরেও তো অনেকগুলি বিস্ফোরণ ঘটান হয়। তাদের ক্ষেত্রে তেমন তো কিছু ঘটে নি? সে সব দেখে আমার মনে তখন একটা প্রশ্ন জেগেছিল।

তাহলে কি পৃথিবীর অভ্যন্তরে ওই ওই দিন এমন কোন ঘটনা ঘটে ছিল যার ফলে ভূস্তরের প্রকৃতিটাই সাময়িকভাবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে থাকবে। এবং এই পরিবর্তনের দরুণ, বিশেষ মাত্রার বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর যতটা জোরে কাঁপা উচিত, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে কেঁপে উঠেছিল।

—সে কথাই আমি আপনাকে বলছি, ডঃ বাসু। এই টেলিগ্রামটি একবার আপনি দেখুন। সুমিত্রা একটি গোলাপী কাগজ এগিয়ে দিল।

ডঃ বাসু গোলাপী কাগজটির ওপর দ্রুত চোখ বোলালেন।

কাগজটির ওপর লেখা: ডঃ রামচন্দ্রন। গতকাল রাত একটায় অস্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি কোন জায়গায় ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটান হয়েছে। এটি ঘটিয়েছে ফ্রান্স। ওদের বক্তব্য, বিস্ফোরণের মাত্রা পঁচিশ কিলোটন। কিন্তু এ পর্যন্ত পৃথিবীর কয়েকটি মানমন্দির থেকে ভূকম্পনের যে সব খবর এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, বিস্ফোরণের মাত্রা প্রায় পাঁচশ' কিলোটন। বাঙ্গালোরের যন্ত্রটি খুব সংবেদনশীল। আপনাদের যন্ত্রে এই ভূকম্পনের মাত্রা কত ধরা পড়েছে, দয়া করে এখুনি জানান। —পিটার এ্যান্টোনিয়েভিচ্। কোওরডিনেটার, বিশ্বপরমাণু শান্তি কমিশন, জেনিভা।

—অ্যাবসার্ড। পঁচিশ কিলোটন মানে? আমি হলফ করে বলতে পারি পাঁচশ' কিলোটনের কম হতেই পারে না। আর তা ছাড়া অস্ট্রেলিয়া হবে কেন? বড় জোর বর্মার কাছাকাছি কোথাও হতে পারে। ডঃ বাসু অটল।

—সে কথাই তো আমি বলছি ডঃ বাসু? যে ভূকম্পন আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে তার উৎপত্তি অস্ট্রেলিয়ায় হতে পারে না। —সুমিত্রা।

—আরও একটা কইনসিডেন্স। সুমিত্রা, লক্ষ্য করেছে, তোমার এই চিরকুটটিতে যে পাঁচটি বিস্ফোরণের ঘটনা লিখেছ তাদের সঙ্গে এর

যেন মিল আছে। মানে, যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা বলছে এক কথা, অথচ আমাদের যন্ত্রে তার মাত্রাটি ধরা পড়ল অন্য রকম।

এ সব দেখে আমার শুধু একজনের কথাই মনে পড়ছে, ডঃ বাসু। ডঃ নিগুচির কোন হাত নেই তো?

ডঃ নিগুচি!

সুমিত্রা যেন আর একটি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসল।

ডঃ বাসু সুমিত্রাকে এক সময়ে ডঃ নিগুচির উদ্ভট পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। বলতে কি, ডঃ নিগুচিকে তিনি ভুলেই গিয়েছিল যেন।

সুমিত্রার কথা শুনে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন ডঃ বাসু।

ওঁরা দুজনেই নীরব।

ক্যানটিনের মেয়েটি খাবার নিয়ে এল।

খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। এখুনি একবার ভূকম্পন-কেন্দ্রে যেতে হবে। ভূকম্পনের উৎপত্তি ঠিক কোথায় ঘটেছিল আর একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বললেন ডঃ বাসু।

সুমিত্রা খেতে শুরু করল।

হোস্টেল থেকে সুমিত্রার সঙ্গে ডঃ বাসু যখন ভূকম্পন কেন্দ্রে পৌঁছলেন, বেলা তখন সাড়ে তিনটে।

উপস্থিত হতেই রিসেপশনিষ্ট হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে জানাল, ডঃ রামচন্দ্রন আপনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন, ডঃ বাসু।

—কোথায় তিনি? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

—তাঁর ঘরে। আরও অনেকেই এসেছেন। ব্যপার খুবই জরুরী।

অপেক্ষা না করে সুমিত্রাকে নিয়ে ডঃ বাসু দোতলায় ডঃ রামচন্দ্রনের ঘরের দিকে এগোলেন।

সচরাচর লিফটে চড়ার ব্যাপারটা ডঃ বাসু পছন্দ করেন না। তাঁর মতে শরীরটাকে এ ধরণের আয়েস থেকে মুক্তি দিলেও চলে। বরং সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় শরীরের পেশীর কাজ করার সুযোগ পায়। রক্তের চলাচল তাতে তরান্বিত হয়। বছর পাঁচ আগে এক ডাক্তার বন্ধু তাঁকে এই উপদেশটি দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক বলেছিলেন, যতটা সম্ভব দৈহিক পরিশ্রমটা এড়িয়ে যেও না। যখন হাঁটবে, জোরে হাঁটবে। বাড়ির ওপর তলায় ওঠার সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠবে, এতে হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

বন্ধুর এ উপদেশটি ডঃ বাসুর ভালো লেগেছিল। এবং তারপর থেকেই এটি তিনি অভ্যাসে পরিণত করেছেন।

তাই ডঃ রামচন্দ্রনের ঘরে যাওয়ার কথা উঠতেই সুমিত্রা যখন বলল, চলুন লিফটে উঠি, ডঃ বাসু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, না সিঁড়ি দিয়ে চল।

ডঃ বাসুর কথায় মুখ টিপে হাসলো সুমিত্রা।

দুজন সিঁড়ির দিকে এগোলেন।

ডঃ বাসু বললেন, কী যেন একটা কথা তুমি বলবে বলেছিলে সুমিত্রা? মানে টেলিফোনে কথা বলার সময়—

সুমিত্রা বলল, আপনার ঘরে বেয়ারা ছিল বলে তখন বলা হয় নি, গাড়িতে আসার সময়ও বলতে পারি নি, পাছে ড্রাইভারের কানে যায়। হ্যাঁ, এখন কেউ কাছে কোথে নেই। ব্যাপারটা এই—মানে, ডঃ নিগুচি নামে একজন বিজ্ঞানীর অদ্ভুত একটি পরিকল্পনার কথা একবার আপনি আমায় বলেছিলেন—

—নিগুচি? তার আবার কী হোল? হঠাৎ এমন একটি প্রসঙ্গে যেন চমকে উঠলেন ডঃ বাসু।

—হ্যাঁ। সে কথাই তো বলছি। ভূকম্পন যন্ত্রে গতকাল রাতের সেই অভাবনীয় ভূকম্পনের উৎ. বলে যে জায়গাটিকে আপনি চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, আজ ভোরে সেখানে একটি প্রচণ্ড দুর্ঘটনা

হয়ে গেছে, ডঃ বাসু।

—তার মানে ? বিস্ময়ে এবার যেন ফেটে পড়বেন ডঃ বাসু।

—কম করেও ষাটজন মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, একটি বিদেশী জাহাজকে কোন রকমে অনিবার্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

—হেঁয়ালী রেখে ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বল সুমিত্রা। ডঃ বাসুর কণ্ঠে ধমকের সুর।

ডঃ রামচন্দ্রনের কাছে প্রথম ঘটনাটার কথাটা শুনে সুমিত্রারও যেন মাথাটা গুলিয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতাও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। ডঃ বাসুর ধমক খাওয়ার পর শুধু একটি কথাই সে বলতে পারল : ঘূর্ণি !

—ঘূর্ণি ? ডঃ বাসুর বিস্ময় এবার চরমে গিয়ে পৌছল।

—ডঃ নিগুচি তাঁর পাগলাটে পরিকল্পনায় ঠিক যে ধরনের ঘূর্ণির কথা আপনাকে বলেছিলেন, সাগরের বুকে তেমন ঘূর্ণিই দেখা গেছে, ডঃ বাসু ?

—ডঃ নিগুচির সেই রূপকথা বঙ্গোপসাগরের বুকে দেখা গেছে বলছ ?

—ঠিক সেই ধরনের ঘূর্ণির কথাই তো ডঃ রামচন্দ্রন আমাকে বললেন।

—ডঃ নিগুচির কথা ডঃ রামচন্দ্রনকে বলনি তো ? ডঃ বাসুর কণ্ঠে আশঙ্কা।

—না, না।—

—ঠিক আছে। আপাতত চেপে যাও। ডঃ নিগুচির কথা আমারও মনে পড়েছিল। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিফোন করে জানলাম, তাঁর হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

কথা বলতে বলতে দুজনে এসে ঢুকলেন ডঃ রামচন্দ্রনের ঘরে।

—আসুন ডঃ বাসু। এসো সুমিত্রা।

ওঁদের দেখে ডঃ রামচন্দ্রন হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন।

ঘরের মধ্যে তখন আর একজন মাত্র মানুষ। তিনি ডঃ মিত্র।

ডঃ রামচন্দ্রনের সামনে অভিনয়ই করতে হল ডঃ বাসুকে।

—কী ব্যাপার বলুন তো? যেন কিছুই জানে না, এমন একটি ভঙ্গীতে কথা বললেন ডঃ বাসু।

—বসুন, বলছি। একটা সাংঘাতিক রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে আজ—সকালের দিকে। বলেই, ডঃ রামচন্দ্রন কোন ভূমিকা না করে একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন ডঃ বাসুর দিকে।

একটা জরুরী টেলিগ্রাম। ওপরে লেখা: টেলিগ্রামটির গোপনীয়তা রক্ষা করবেন। পাঠিয়েছেন দিল্লির আবহাওয়া দপ্তর।

টেলিগ্রামে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, নিকবরের দক্ষিণে গ্রেট চ্যানেলে আজ ভোরে সমুদ্রের বুকে এক ভয়ঙ্কর ঘূর্ণি দেখা গেছে। ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কম করেও সত্তরজন মাল্লা এবং মৎস্য বিভাগের কর্মী কয়েকটি লঞ্চ সমেত ডুবে গেছে। এ পর্যন্ত কাউকে রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। ইকুয়াডোরের একটি মালবাহী জাহাজ 'দ্য শার্ক'-এর ক্যাপ্টেন ক্রিস্টোবাল হিহং এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর জাহাজও ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে সাবাড় হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল। ঘটনাটি ঘটে সকাল আটটা নাগাদ। জরুরী তারবার্তা পেয়ে নিকবরের পোর্ট কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্ধারের কাজে ছুটে যায় সৌভাগ্য, জাহাজটিকে কোন রকমে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তবে জলের তোড়ে জাহাজটির হালটি নষ্ট হয়ে গেছে। উদ্ধার কার্যে সাহায্য করেছে শিপিং করপোরেশনের জাহাজ অজন্তা। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন শ্রী কুলকারনি জানাচ্ছেন, ওই অঞ্চলে সমুদ্রের বুকে এমন ধরণের ঘূর্ণি একটি অভাবিত ঘটনা। আবহাওয়া দপ্তরের প্রধানের আবেদন, বাঙ্গালোরের গবেষণাগার এতটুকু দেরি না করে এখুনি এ ঘটনার ব্যাপারে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দিন।

টেলিগ্রামটি পড়ার পর যেন মূক হয়ে গেলেন ডঃ বাসু। অজানিত এক আশঙ্কায় মুহূর্তের জন্যে তাঁর সমস্ত অনুভূতি কে যেন কেড়ে নিল।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, কিছু অন্তত বলুন, ডঃ বাসু ?

ডঃ বাসু ডঃ মিত্রের দিকে চাইলেন।

ডঃ মিত্র বললেন, আমিও সব কিছু গুলিয়ে ফেলেছি। বঙ্গোপসাগর এবং ভারত মহাসাগরের আবহাওয়া নিয়ে গত কুড়ি বছর ধরে আমি গবেষণা করছি। কিন্তু এর মধ্যে এমন ধরনের আজগুবী ব্যাপার কখনো ঘটেছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে, শ্রী কুলকারনি যে জায়গাটার কথা বলেছেন অক্টোবরের দিকে সেখানকার সমুদ্র খুবই শান্ত থাকে বলেই তো জানা ছিল। ঘূর্ণি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আপনি আসার আগে ডঃ রামচন্দ্রনকে সে কথাই আমি বলছিলাম, ডঃ বাসু।

ডঃ বাসু কী যেন বলতে গেলেন।

ডঃ রামচন্দ্রন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, একটা অদ্ভুত যোগাযোগ লক্ষ্য করেছেন, ডঃ বাসু ? গতকাল ঠিক যে অঞ্চলটিকে ভূকম্পনের উৎসস্থল বলে আপনি বলতে চেয়েছেন, ঘূর্ণিটা ঠিক সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে বলে আপনার মনে হচ্ছে না ?

—তাই তো দেখছি। ডঃ বাসুর সংক্ষিপ্ত উত্তর।

—যদি ধরে নেওয়া যায় ওই অঞ্চলে সমুদ্রের গভীরে ভূ-তাত্ত্বিক কোন ঘটনা ঘটে থাকবে—মানে ধরুন, সেখানে কোন একটি ডুবো আগ্নেয়গিরি হঠাৎ ফেটে পড়ল—

ডঃ রামচন্দ্রনকে শেষ করতে না দিয়েই ডঃ বাসু বললেন, মাফ করবেন, ডঃ রামচন্দ্রন, তেমন কোন ঘটনা ঘটলে নিকবর দ্বীপপুঞ্জে প্লাবন দেখা দিত। তা যখন হয় নি, তখন অমন কোন ঘটনার কথা নাই বা ভাবলেন ?

—জানি। তবু সেই ঘূর্ণি কেন হোল তার একটা কারণ তো

খুঁজে বের করতে হবে ?

—আপাতত এ সম্পর্কে আপনাকে আমি কিছুই বলতে পাচ্ছি না, ডঃ রামচন্দ্রন। দয়া করে আমাকে চব্বিশ ঘণ্টা অন্তত: ভাবতে দিন। তারপর হয়ত কিছু একটা বলতে পারব।

ডঃ বাসুর হঠাৎ এই মন্তব্যে ডঃ রামচন্দ্রন এবং ডঃ মিত্র দুজনেই চমকে উঠলেন।

—আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে কিছু একটা আপনি যেন অনুমান করতে পেরেছেন, ডঃ বাসু ? বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

—এখন আমি কোন মন্তব্যই করব না ডঃ রামচন্দ্রন। আশা করি আমাকে এর জন্যে ক্ষমা করবেন। বরং জরুরী অনুসন্ধানের কী কথা আপনি বলছিলেন যেন— ?

—হ্যাঁ, তার জন্যেই তো আমাদের এই বৈঠক। ডঃ রামচন্দ্রন ডঃ বাসুকে আর প্রশ্ন না করে সরাসরি কাজের কথা পেড়ে বসলেন। কারণ ডঃ বাসুর কথা শুনে পরিষ্কার তিনি বুঝতে পারলেন, মূল সমস্যার কিছুটা ইঙ্গিত নিশ্চয় তাঁর জানা। সময় হলেই তিনি তাঁকে জানাবেন।

এর পর আধ ঘণ্টার মত বৈঠক হল। কী ভাবে অনুসন্ধানের কাজে হাত দেওয়া যায় সে নিয়ে একটি চূড়ান্ত খসড়াও তৈরি করা হল। ঠিক হল, পরদিন ভোরের ফ্লাইটে ডঃ রামচন্দ্রন, মিত্র, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা—এই কয়জনের একটি ছোট দল কলকাতা হয়ে পোর্টব্লেয়ার যাবেন। কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে এসে যোগ দেবেন ডঃ দত্ত। এ ভদ্রলোকটিকে দরকার। নিকবর অঞ্চলের সমুদ্র তাঁর নখদর্পণে। অবশ্য ঠিক কীভাবে কাজে এগোতে হবে, সে সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোন কার্যসূচি তখনকার মত করা সম্ভব হল না। বিশেষ করে ডঃ বাসু পুরো সময়টাই এমন গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন যে উপস্থিত কারোর পক্ষেই খোলাখুলি আলোচনা করা সম্ভব হল না।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, দিল্লি থেকে পররাষ্ট্র সচিব আমাকে ব্যক্তিগতভাবে একটা নোট পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন, আমাদের অনুসন্ধানের কাজটি যতটা সম্ভব যেন গোপন রাখি।

—সে আবার কি ব্যাপার? প্রশ্ন করলেন ডঃ মিত্র।

—জানি না, মশায়। গোপনে রাখি, শুধু এটুকুই আমাকে বলা হয়েছে। কে জানে? আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোথায় যে কী হচ্ছে সে তো আর আপনি আমি চট করে জানতে পারব না? কিন্তু ব্যাপার কি বলুন তো ডঃ বাসু? কেমন যেন আপনাকে অন্যমনস্ক দেখছি? ভাল কথা। দমদম বিমান বন্দরে কাল আমরা গিয়ে পৌঁছব বিকেল পাঁচটা নাগাদ। সেখানে আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশন থেকে কে একজন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ্ আমাদের সঙ্গে এসে মিলবেন। ভদ্রলোক আসছেন জেনিভা থেকে। তিনিও আমাদের সঙ্গে নিকবরে যাবেন বলে পররাষ্ট্র দপ্তরের নোটটিতে বলা হয়েছে! ভদ্রলোকটি সম্পর্কে আপনি কি কিছু জানেন ডঃ বাসু?

—পিটার অ্যাণ্টোনিয়েভিচ্? ডঃ রামচন্দ্রনের মুখে নামটি শুনে এবার বেশ খানিকটা চমকেই উঠলেন ডঃ বাসু। অ্যাণ্টো-নিয়েভিচের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল অপার কৌতূহলের চিহ্ন।

—চিনি। বললেন ডঃ বাসু। —বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর যথেষ্ট নাম আছে। এখন তিনি আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশনের 'শান্তির জন্যে পরমাণু শক্তি' দপ্তরের চেয়ারম্যান। এক সময়ে—প্যারিসে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। পরে আরও কয়েকবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে।

সমস্ত আলোচনাটাই চলল খুবই খাপছাড়া ভাবে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুমিত্রাকে সঙ্গে নিয়ে ডঃ বাসু তাঁর হস্টেলে ফিরে এলেন।

হস্টেলে নিজের ঘরে ফিরে আসার পর ওয়েটারকে ডেকে দু কাপ

কফির অর্ডার দিলেন ডঃ বাসু।

সুমিত্রা চুপ করে সোফার ওপর কিছুক্ষণ বসে রইল।

ডঃ বাসু ইতিমধ্যে আলমারি খুলে কী সব কাগজ পত্র খুঁজতে লাগলেন।

—হ্যাঁ, পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত। একটি ফাইল নিয়ে কাগজ ওল্টাতে ওল্টাতে কথা বললেন ডঃ বাসু। ফাইলটি নিয়ে সুমিত্রার সামনের সোফায় এসে বসলেন।

ডঃ নিগুচিকে তাহলে আপনি সন্দেহ করছেন, ডঃ বাসু? ঘরের নীরবতা ভাঙল সুমিত্রা।

—আমার ধারণা, এ কাজ ডঃ নিগুচির। কিন্তু একটা কথা মোটেই বুঝতে পারছি না সুমিত্রা। ভারত সরকার যে রিপোর্টটি পাঠিয়েছে তাতে কিন্তু ভূ-কম্পনের কথা বলা হয় নি। আরও একটি ব্যাপার দেখে খানিকটা অবাক হচ্ছি আমি। এত বড় যে ভূমিকম্প ঘটে গেল, পৃথিবীর বেশ কয়েকটি মানমন্দিরে তা ধরাও পড়েছে। অথচ এখনও পর্যন্ত কারোর মুখে কোন সাড়া শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। মানে, কাগজওয়ালারাও কি এমন সংবাদ এখনও পর্যন্ত পায় নি? অনেকক্ষণ পর এই প্রথম একটানা কথা বলে গেলেন ডঃ বাসু।

সুমিত্রা বলল, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কথা শুনে আপনার মুখ ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল কেন বলুন তো?

—সে কথা এখন থাক, সুমিত্রা। সময় মত বলব। যাক যে জন্যে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। এই কাগজগুলি নিয়ে যাও। আজ রাতে এবং সম্ভব হলে কাল ভোরের দিকে একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখো। নিকবর যাওয়ার সময় এগুলি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

ওয়েটার কফি এবং কিছু স্ন্যাকস রেখে চলে গেল।

ডঃ বাসু বললেন, কফি খেতে খেতে কা· ·গুলি দেখে নাও।

সুমিত্রা দেখল, পর পর পাঁচটি কাগজ। প্রথমটিতে লেখা

কয়েকটি গাণিতিক মডেল। কতকগুলি জটিল সমীকরণের নিচে টিকাটিপ্পনি। পৃথিবীর বুকে কোন জায়গায় কী ধরণের বিস্ফোরণ ঘটলে তার ঘাত কী ভাবে ছড়িয়ে পড়বে সমীকরণগুলি দিয়ে সে সব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরের তিনটি কাগজে পৃথিবীর ভূস্তরের বিভিন্ন অংশের ছবি। শেষের কাগজটিতে আছে—হ্যাঁ, সমুদ্রই তো মনে হয়। সমুদ্র। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। তার বুকে ঘূর্ণি। একটি নয় পাশাপাশি দুটি।

ছবিটি দেখেই চমকে উঠল সুমিত্রা।

—সমুদ্রের বুকে যেন দুটি রাক্ষুসে ঘূর্ণি, তাই না, ডঃ বাসু।

—আমি ওদের নাম রেখেছি সমুদ্রের চোখ।

—কাব্যিক নাম তো ? কিন্তু ব্যাপারটা কি ?

— ডঃ নিগুচির কথা বলছিলে না ? জান, সুমিত্রা, ওঁর সব উদ্ভট পরিকল্পনা নিছক পাগলামী বলে মনে হলেও, তার মধ্যে মৌলিক চিন্তা ভাবনার কিছু খোরাক আমি দেখতে পেয়েছিলাম। অস্টিনে থাকার সময় এই ছবিটি আমি এঁকেছিলাম ওঁরই পরিকল্পনা মত। হস্টেলে ফেরার পথে ছবিটির কথা মনে পড়ল। আমি হলফ করে বলতে পারি সুমিত্রা, যে ভূকম্পনের কথা ভেবে আমরা সবাই বিচলিত, যদি তার পেছনে ডঃ নিগুচির হাত থাকে, তাহলে আমার এ ছবিটিও মিথ্যে হবে না।

—আপনার কথার কোন তাৎপর্য আমি বুঝতে পারলাম না।

সুমিত্রার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর ডঃ বাসু একদিন ডঃ নিগুচির সমস্ত পরিকল্পনার কথাই বলেছিলেন। শুধু বাদ দিয়েছিলেন একটি। এই ছবিটির কথা। বলতে পারেন, এটা তাঁর একান্ত গোপনীয় দলিল।

ডঃ নিগুচির কথা মনে পড়তেই আনমনা হলেন ডঃ বাসু।

টেকসাসের একটি সন্ধ্যার কথা মনে পড়ল।

ভূকম্পনের ওপর কয়েকটি মৌলিক গবেষণা করে তখন তিনি

অনেকটা নাম করে ফেলেছেন। তাঁর ধারণা, পৃথিবীর ভূস্তরের মধ্যে যদি কোন ফাটল ধরে, আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে সমুদ্রের অথবা নদীর জল যদি কোন ক্রমে চুইয়ে চুইয়ে ভেতরে ঢোকে—সে জল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। অবশ্য এ নিয়ে এর আগে আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী কাজ করেছেন। পৃথিবীর ভূস্তরের গভীরে আছে গলন্ত বস্তুসামগ্রী। তরল। প্রচণ্ড গরম তরলের স্পর্শে ঠাণ্ডা জলের প্রতিক্রিয়া যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায়—এটা আগেই জানা ছিল। সেই বিস্ফোরণের আঘাত কী ভাবে ছড়িয়ে পড়ে—সেটা নিয়েই মৌলিক একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন ডঃ বাসু। তত্ত্বটি যথেষ্ট সমর্থনও পেয়েছিল। তাঁর মতে প্রাকৃতিক ওই বিপর্যয়কে তাঁর তত্ত্বের সাহায্যে মানুষ হয়ত একদিন তার নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারবে। ডঃ নিগুচি এই তত্ত্বটি নিয়েই ডঃ বাসুর সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছিলেন তাঁর আবাস সন্তারিতায় জানুয়ারির মাঝামাঝি কোন একটি সময়।

দিনটির কথা ডঃ বাসু এখনও যেন ভুলতে পারেন না। বাইরের পথঘাটে বরফ, তাপমাত্রা নেমে শূন্যের প্রায় পনের ডিগ্রি নিচে। উনিশ নম্বর পশ্চিমের রাস্তাটা, যা সব সময়ই জনাকীর্ণ থাকে, জনবিহীন। নিজের অ্যাপার্টমেণ্টে তিনি একক।

এমন সময় এলেন ডঃ নিগুচি।

—কী ব্যাপার? এমন আবহাওয়ার মধ্যে আপনি?

—আসতে হোল। একটি জরুরী কাজ। বলেই ঘরের মধ্যে এসে বসলেন ডঃ নিগুচি। তাঁকে বেশ চিন্তিত মনে হচ্ছিল যেন।

—এত কষ্ট না করে, টেলিফোনেও তো কথা বলতে পারতেন?

—এ সব কথা টেলিফোনে বলা চলে না। তা ছাড়া কথা বলতে খানিকটা সময়েরও দরকার। অতক্ষণ ধরে কথা বলে টেলিফোনের লাইন আটকে রাখাটা ঠিক হবে না বলেই, আমাকে আসতে হোল, ডঃ বাসু।

—বসুন। আপনার জন্যে কফির জল চাপিয়ে দিই। বলেই

ডঃ বাসু ইলেকট্রিক কুকিং রেঞ্জে জল বসাতে গেলেন।

—ধন্যবাদ। বললেন ডঃ নিগুচি।

বাইরে ঝড়ো বাতাস। ভেতরে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত উষ্ণ পরিবেশ। কফির কাপ হাতে নিয়ে একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন ডঃ নিগুচি। বেশির ভাগ প্রশ্নই প্রশান্ত মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, চীন সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের কয়েকটি অঞ্চল নিয়ে। ওই সব অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি, ডুবো পাহাড়—প্রচণ্ড ভূমিকম্পনে তাদের মধ্যেকার ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন কী ভাবে ঘটে এসব নিয়ে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে খুঁটিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন করলেন ডঃ নিগুচি।

একটা মানুষ আত্মমগ্ন হতে হতে মনের কত গভীরে যে ডুবে যেতে পারে, ডঃ নিগুচিকে না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না। জাপানীরা এমনিতেই কম কথা বলে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা ভৌগোলিক কারণে স্বপ্নবিলাসী মন তাদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠতে পারে না বলেই অনেকের বিশ্বাস। তবু সেদিন মনে হয়েছিল, ডঃ নিগুচি অন্ততঃ ওই মুহূর্তের, মধ্যে যেন ব্যতিক্রম। ডঃ বাসুর সঙ্গে ভূকম্পন এবং ভূতত্ত্বের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে একটি খাতায় সেই. সঙ্গে কী যেন টুকে যাচ্ছিলেন। কতকগুলি গাণিতিক সূত্র অথবা সমাধান। ডঃ বাসু সে সবের কিছুই বুঝতে পারেন নি।

মনে পড়ে কথার ফাঁকে একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ডঃ বাসু, ধরুন সমুদ্রের নিচে বিস্ফোরণটা এই ভাবে ঘটল, এবং তাকে যদি এইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, প্রতিক্রিয়াটি কেমন দাঁড়াবে—কথাটি শেষ না করেই পেন্সিল দিয়ে কাগজের ওপর এঁকে দিলেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। সেই সমুদ্রের বুকে চক্রাকার দুটি ঘূর্ণি— !

আর তারপরই আত্মগতভাবে বলেছিলেন, সমাধানটি পাওয়া গেছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, ডঃ বাসু।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ডঃ বাসু। ডঃ নিগুচি একটি জটিল

প্রশ্নের এত তাড়াতাড়ি সমাধান বের করতে পারেন ?

কিন্তু প্রশ্ন এই, হঠাৎ ভূকম্পন নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন কেন ?

প্রায় ঘণ্টা দুই পর বাইরে আগ্রাসী প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেই তিনি যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন।

—বাইরে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস। একটু বসে গেলে হোত না ? বলেছিলেন ডঃ বাসু।

ডঃ নিগুচি বলেছিলেন, জাপানের হারিকেন আপনি দেখেন নি, ডঃ বাসু। আমি তিনবার তার মধ্যে পড়েছিলাম। তারপর থেকে এ ধরণের ঝড় দেখে আর ভয় পাই নে। ও কে. গুড্ নাইট।

ডঃ নিগুচি চলে যাওয়ার পর ডঃ বাসু মন্তব্য করেছিলেন—আপনি শুধু স্বপ্নবিলাসীই নন। দুর্ধর্ষ এবং বেপরোয়াও বটে।

এই ঘটনার পর অনেকের কাছ থেকেই ডঃ নিগুচি সম্পর্কে নানা রকম কথা তাঁর কানে এসেছে। সেদিন ডঃ লি'র কাছে গিয়েছিলেন সৌর বিকিরণ নিয়ে আলোচনা করতে। কেন জানো ? উনি নাকি এক ধরণের বৈদ্যুতিক আলো তৈরি করেছেন। এই আলোকে বিশেষ ধরণের ব্যবস্থায় ছেঁকে বিশেষ ধরণের তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো তৈরি করা যায়।

—তার মানে ? প্রশ্ন করেছিলেন ডঃ বাসু।

—মানে আর কি ? সূর্যের দৃশ্যমান আলোর মধ্যে সাতটি রঙ আছে তো ? ধর, তুমি চাও বিশেষ একটি বর্ণের বিকিরণ। বিশেষ বর্ণের আলো মানেই তো বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো ? ডঃ নিগুচি এমন একটি যন্ত্র বের করেছেন, যে যন্ত্র সহজে সূর্যের সাত রঙ আলো থেকে আকাঙ্খিত বর্ণের আলো ছেঁকে বের করে নিতে পারে।

—এতে কাজটা কী হবে ? ডঃ বাসুর কণ্ঠে বিস্ময়।

—সেটা অবশ্য বলেন নি।

না। একজন নয়। টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিশেষজ্ঞই ডঃ নিগুচির হাত থেকে রেহাই পান নি। কখনও আলো, কখনও

পৃথিবীর ভূগর্ভস্থ উত্তাপ, কখনও বা সাগর তরঙ্গের গতি প্রকৃতি—অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনা নিয়ে তাঁদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আর যে দিন নিগুচি বিশদভাবে তাঁর এক উদ্ভট পরিকল্পনার কথা ডঃ বাসুকে শোনান, তার পরদিনই ডঃ নিগুচির টেকসাস ছেড়ে কোথায় যেন চলে যান। এর পর সময়ের ব্যবধানে ডঃ বাসু তাঁর কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

এর এক বছর পর সমুদ্রের গভীরে, সম্ভবত সুমিত্রার কাছাকাছি একটি অঞ্চলে—একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরিতে বিস্ফোরণ হয়ে সুমাত্রা এবং জাভার কয়েকটি অঞ্চলে জলপ্লাবন ঘটেছিল। সে খবর খবরের কাগজগুলিতেও প্রকাশিত হয়। ওই সময় ওই বিস্ফোরণের দরুণ সমুদ্রের বুকে কী ধরণের ব্যাপার ঘটতে পারে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডঃ বাসু একটি ছবি এঁকেছিলেন। যেটি দেখতে হয়েছিল ডঃ নিগুচির সেই ছবিটির মত। নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। সমুদ্রের ওপর পাশাপাশি দুটি ঘূর্ণি।

ছোট্ট সেই কাগজের ওপর অনেকক্ষণ চেয়ে রইল সুমিত্রা।

এক টুকরো কাগজ। তার ওপর পেন্সিলে আঁকা সমুদ্রের ছবি। সমুদ্রের নিচে অদ্ভুত দুটি পাহাড়। আর তার বুকে পাশাপাশি দুটি ঘূর্ণি।

ডঃ বাসুর ভাষায় সমুদ্রের চোখ।

সামনের টেবিলটির ওপর মেলে ধরা সেই কাগজের টুকরোর ওপর নির্নিমেষ দৃষ্টিতে প্রচণ্ড কৌতূহল নিয়ে সমুদ্রের বুকের ওপর আকা ঘূর্ণি দুটির মধ্যে সুমিত্রা যেন পুরোপুরি তলিয়ে গেছে। ডঃ বাসু এর জন্যেই মেয়েটিকে ভালবাসেন। বলতে বাধা নেই গত তিন মাস ধরে নিয়মিত গবেষণায় সুমিত্রা তাঁকে প্রচুর সাহায্য করেছে। বরং বলা চলে সীমিত এই সময়ে বেশ কিছু নতুন তথ্য জুগিয়ে তাঁকে সে যথেষ্ট সাহায্যও করেছে

না। ভুল তাঁর হয় নি।

পরদিন ব্রেকফাস্ট খাবার সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো! কথা বললেন ডঃ বাসু।

—সুপ্রভাত। আমি ডঃ রামচন্দ্রন কথা বলছি। ডঃ বাসু।

—সুপ্রভাত ডঃ রামচন্দ্রন। বলুন, নতুন কোন খবর এলো?

—নতুন খবর? বলছেন কি, মশায়। সাংঘাতিক কাণ্ড। জেনিভা থেকে এই মাত্র আপনাকে দেবার জন্যে একটি কেবল পেলাম। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ পাঠিয়েছেন। তিনি এখন নিকবরের পথে। ভারত সরকার যে ঘূর্ণিটির কথা বলেছেন, তার পাশে আরও নাকি একটি ঘূর্ণির সন্ধান পাওয়া গেছে। ডঃ রামচন্দ্রনের কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় যেন কেঁপে উঠল।

ডঃ বাসুও তখন রীতিমত উত্তেজিত। ব্রেকফাস্ট ততক্ষণে শিকেয় উঠেছে।

—বলুন, বলুন, ডঃ রামচন্দ্রন। আমি জানতাম এটাই হওয়া স্বাভাবিক। বললেন ডঃ বাসু।

—আপনি বলছেন, আপনি জানতেন?

—ঠিক আছে। সে কথা আপনাকে আমি পরে বলছি। কেবলে আর কী বলা হয়েছে, বলুন দেখি।

—ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ জানাচ্ছেন, পরশু রাত দেড়টা নাগাদ গ্রেট চ্যানেলের উপর দিয়ে মার্কিন দেশের একটি আবহাওয়া সন্ধানকারী কৃত্রিম উপগ্রহ যখন ভেসে যাচ্ছিল ব্যাপারটা ধরা পড়ে তখনই। উপগ্রহটির ইনফ্রারেড ক্যামেরা রাতের অন্ধকারে তখন ওই অঞ্চলের সমুদ্রের বুকের ছবি তুলছিল এবং প্রত্যেকটি ছাপ সিনক্রোনাস উপগ্রহের মাধ্যমে রিলে করে গডার্ড স্পেস সেন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছিল। উপগ্রহটি গ্রেট চ্যানেল এলাকায় যে ছবিগুলি তুলেছে তার কয়েকটি

ছবিতে ওই অঞ্চলের সমুদ্রে পাশাপাশি দুটি ঘূর্ণিকে দেখা গেছে। তাদের দেখলে মনে হয় তারা যেন সমুদ্রের বুকে দুটি চোখ।

—ঠিক কথা। তাহলে কৃত্রিম উপগ্রহের ইনফ্রারেড-ক্যামেরায় ঠিক ছবিই উঠেছে। কতকটা আত্মগতভাবেই যেন কথাগুলি উচ্চারণ করলেন ডঃ বাসু।

—কী সব বলছেন, ডঃ বাসু। যেন মনে হচ্ছে, এ সব কথা আপনার জানা? ডঃ রামচন্দ্রন এবার যেন বিস্ময়ে ফেটে পড়বেন।

—আপনার টেলিফোন পাওয়ার আগে পর্যন্ত এটা শুধু আমার অনুমান ছিল। এবার মনে হচ্ছে আমি মিথ্যে ভাবি নি। কিন্তু একটা কথা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না—এতটা করা এরই মধ্যে কী ভাবে সম্ভব হল?

ডঃ বাসু টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

প্রায় এক মিনিট নীরবতা। ডঃ বাসুর মনে হল, এবার যেন মাথার ভেতরকার সমস্ত চিন্তা ভাবনা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেছে। চোখের ওপর ভেসে উঠল ডঃ নিগুচির মুখ। টেকসাসে শেষবার দেখা সেই মুখটি। নিরুচ্ছ্বাস অথচ অদ্ভুত আকর্ষণ মাখানো মুখ। আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে ডঃ নিগুচি তাঁর পরিকল্পনার কথা বলে চলেছেন। যেন রূপকথা!

আবার টেলিফোনের রিসিভারটি তুলে নিলেন তিনি। ডায়াল করলেন।

—সুমিত্রা, আমরা মিথ্যে অনুমান করি নি। সমুদ্রের বুকে পাশাপাশি দুটি চোখ দেখা যাচ্ছে—

—কী বলছেন আপনি? সব শুনে সুমিত্রার কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় কেঁপে উঠল।

—গতকাল রাতে সেই পুরনো সমীকরণগুলি আমি আবার কষে ছিলাম, ডঃ বাসু। দেখলাম, সেই সব সমীকরণ থেকে একমাত্র আপনার আঁকা ছবিই পাওয়া যেতে পারে।

ডঃ বাসু আজ নিজেই ড্রাইভ করলেন। উত্তেজনা, কৌতূহল এবং সাফল্যের আনন্দে গত রাতের সেই ক্লান্তি মুহূর্তে কোথায় উবে গেছে। সুমিত্রা এরই মধ্যে হস্টেল থেকে বেরিয়ে এসে পেভমেন্টের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। ভোরের রোদে ডঃ বাসুর মনে হল সুমিত্রাকে যেন অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে। তারুণ্য! এক অপার্থিব তারুণ্য যেন ডঃ বাসুকে গ্রাস করে ফেলেছে। গত চব্বিশঘণ্টা একটানা যে দুশ্চিন্তা তাঁকে আচ্ছন্ন করে তুলেছিল—নিমেষে তার সমাপ্তি ঘটেছে। অভূতপূর্ব সাফল্যের উষ্ণতায় পৃথিবীর পুরোটাই এখন তাঁর কাছে অপার্থিব সৌন্দর্যের আকর বলে মনে হচ্ছে।

একেবারে সুমিত্রার গা-ঘেঁষে গাড়ি থামালেন ডঃ বাসু।

—এসো সুমিত্রা! গাড়ির দরজা খুলে সুমিত্রাকে উঠে আসতে বললেন তিনি।

শুধু আসতে বলা নয়। আনন্দের আতিশয্যে তাকে হাত ধরেই তুলে নিয়ে এসে পাশের আসনে বসিয়ে দিলেন যেন।

—ইউ আর রিয়েলি এক্সাইটেড, ডঃ বাসু?

—সরি! ডঃ বাসুর মনে হল তাঁর হঠাৎ এমন ব্যবহারে হয়ত সুমিত্রা খানিকটা ক্ষুণ্ন হয়েছে।

—না না, এর জন্যে নয়। আপনার সাফল্যে আপনি দারুণ আনন্দিত হয়েছেন, আমি এ কথাই বলতে চেয়েছি ডঃ বাসু। সুমিত্রার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল।

—যাক। আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

—এখন চলুন! সুমিত্রা ডঃ বাসুর হাত স্পর্শ করলেন।

—ধন্যবাদ। ডঃ বাসু অ্যাকসেলেটারের ওপর পা রাখলেন।

ডঃ রামচন্দ্রনের বাংলোয় পৌঁছোতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না। মোরাম বেছান রাস্তা দিয়ে তাঁর লনের পাশে গাড়ি পার্ক করতেই বেরিয়ে এলেন তিনি।

—আসুন, আসুন ডঃ বাসু! এসো সুমিত্রা! বললেন তিনি।

দুজনকে পাশাপাশি দেখে তাঁর ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমি-হাসি খেলে গেল।

—কুড্ বি এ গুড ম্যাচ্।' রসিকতা করলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

—ধন্যবাদ! ডঃ বাসুব মুখে হাসি।

সুমিত্রা গম্ভীর হয়ে গেল।

—বসুন আপনারা। চা তৈরিই আছে। সুমিত্রা, দয়া করে এ ব্যাপারটা তুমি দেখ।

—ও থ্যাঙ্ক ইউ। আপনাবা কথা বলুন। আমি চা তৈরি করছি।

পত্নী বিয়োগের পর অপুত্রক ডঃ রামচন্দ্রনের বৈরাগীর সংসার। সুমিত্রা তা জানে। রান্নাবান্নার লোক থাকলেও সকালের চা'টা তিনি নিজেই তৈরি করে নেন। এটা তাঁর অভ্যাসে এসে দাঁড়িয়েছে। সুমিত্রা এবং ডঃ বাসুর আসার আগে তিনি চায়ের সমস্ত কিছু জোগাড় করেই রেখেছিলেন। সুমিত্রা চা তৈরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—বলুন ডঃ বাসু।

ডঃ বাসু মুহূর্তের মধ্যে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

এক মিনিট বিরতি। তারপর শুরু করলেন ডঃ নিগুচির কাহিনী।

সুমিত্রা চা দিয়ে গেল।

ডঃ বাসু একটানা বলে গেলেন যা ডঃ নিগুচি সাপ্তারিতায় জানুয়ারীর এক বরফ ঝরা দিনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁকে শুনিয়েছিলেন। বিস্তারিত। সম্পূর্ণ।

অবশেষে গল্প যখন থামল, সারা ড্রইং রুমে তখন পাহাড়ের নিস্তব্ধতা।

বাঙ্গালোর থেকে ঠিক দুপুর বারোটায় ইনডিয়ান এয়ার লাইনসের একটি অ্যাভ্রো প্লেনে নিকোবর যাত্রা করলেন ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ বাসু

এবং সুমিত্রা। এ ব্যবস্থা অবশ্য ভারত সরকারই করেছিল। কলকাতায় একজন নতুন সঙ্গী জুটল ডঃ অশোক দত্ত। নিকোবরের পথঘাট এবং সমুদ্রের পরিবেশ সম্পর্কে এ ভদ্রলোকটির অভিজ্ঞতা দীর্ঘ দিনের।

ডঃ বাসু ডঃ দত্তকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বাবা! ভাগ্যবান তাহলে আমি। আপনারা সবাই দেখছি বিজ্ঞানী। তা ব্যাপার কি বলুন তো, মশায়? হঠাৎ এ ভাবে আপনাদের সঙ্গে আমাকে তড়িঘড়ি পাঠানোর মানে কি, কিছুই তো বুঝতে পারছি না?

—কেন? আমাদের সঙ্গে কেন আপনি যাচ্ছেন সে কথা কি আপনাকে বলা হয় নি? প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

—পরিষ্কার করে কিছু বলা হয় নি। তবে দমদম এসে এই প্লেনের ফ্লাইট অফিসার ক্যাপটেন চোপরার কাছ থেকে জানলাম ডিফেন্সের একটি জরুরী অপারেশনে আমাদের নিকবর যেতে হচ্ছে।

—সমুদ্রের বুকে গত পরশু যে একটি—না, দুটিও হতে পারে—ঘূর্ণি দেখা গেছে। হঠাৎ সেখানে অমন ঘূর্ণি সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী, এটা জানার জন্যেই, মানে তার ওপর অনুসন্ধান করার জন্যেই তো আমরা যাচ্ছি? দিল্লি থেকে প্রতিরক্ষা দপ্তর এ কথাটাই শুধু আমাদের জানিয়েছে।

ঘূর্ণি? বলেন কি, মশায়। এই অক্টোবর মাসে নিকবরের আশপাশে আবার ঘূর্ণি দেখা যাবে কেন? পনের বছর ওই সব অঞ্চল আমি চষে বেড়িয়েছি। সেখানকার সমস্ত আটঘাট আমার জানা। কিন্তু এমন তো কখনও শুনি নি।

—তাহলে দেখছি, ঘূর্ণির কথা আপনি জানেন না। কেমন যেন বিস্ময় প্রকাশ করলেন ডঃ বাসু। নিকবরের সংবাদটি শুনে অশোক দত্ত বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন যেন।

ডঃ রামচন্দ্রন সামনের আসনে বসে পিছন ফিরে চুপ করে বসে আছেন। এ ধরণের পরিবেশে সুমিত্রা সব সময়ই নিশ্চুপ হয়ে বসে

থাকা পছন্দ করে। ভারতীয় বিমান বহরের ভাইকাউন্ট তখন বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আন্দামানের দিকে উড়ে চলেছে। ওপরে পরিষ্কার আকাশ। লক্ষ কোটি নক্ষত্রের ভীড়। নিচে অদৃশ্য অন্ধকার। তার মাঝে মাঝে ছোট ছোট আলোর বিন্দু। সে আলো সাগরপাড়ি কোন জাহাজের হয়ত। আর প্লেনের ভেতর অশোক দত্তের একটানা সংলাপ।

বিমান বন্দরে গিয়ে তাঁরা যখন পৌছলেন রাত তখন ন'টা। বিমান বন্দরের বাইরে দুটি অ্যামবাসাডোর অপেক্ষা করছিল। সেনা বিভাগের একজন অফিসার তাঁদের অভ্যর্থনা জানানর জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রাথমিক সম্ভাষণের পালা শেষ করতে মিনিট তিনেক লাগল।

অফিসারটি বলল, আমরা দুঃখিত স্যারস্। আপনাদের খুব বেশি বিশ্রামের সময় আমরা দিতে পারব না। এখন রাত ন'টা। এখান থেকে সরকারী অতিথিশালায় যেতে আমাদের মিনিট পনের লাগবে। দশটায় ডিনার। ডিনারের পর সেখানেই একটি জরুরী কনফারেন্স আমাদের সেরে নিতে হবে। কমোডোর ব্যানার্জি সেই কনফারেন্সেই সব কথা আপনাদের বুঝিয়ে বলবেন। দয়া করে এখন আমার সঙ্গে আপনারা আসুন।

একেবারে যাকে বলে মিলিটারি কায়দা। সেই ভাবেই ভদ্রলোকটি ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ বাসু, সুমিত্রা এবং ডঃ অশোক দত্তের উদ্দেশ্যে কথাগুলি যেন ছুঁড়ে দিলেন।

অফিসারটি গাড়ির পেছনের দরজা খুলে দিয়ে সুমিত্রার উদ্দেশ্যে বললেন, উঠুন ম্যাডাম।

ওঁদের বসা হলে অফিসারটি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উঠলেন দ্বিতীয় গাড়িটিতে।

পরক্ষণেই দুখানা অ্যামবাসাডোর আঁকা বাঁকা পথ ধরে অতিথি শালার দিকে ছুটে চলল।

ঠিক মিনিট পনেরর মধ্যেই অ্যাম্বাসাডোর এসে দাঁড়াল একটি সৌখিন বাড়ির সামনে।

ডঃ দত্ত বললেন, আমরা এসে গেছি।

অন্য গাড়িটি থেকে সেই অফিসারটি এসে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। সুমিত্রা নামল প্রথমে। তার পেছনে ডঃ বাসু এবং ডঃ রামচন্দ্রন। তাঁরা নীরবে অফিসারটিকে অনুসরণ করলেন।

অফিসারটি তাঁদের একটি ঘরে পৌঁছেদিলেন। সেই সঙ্গে প্রত্যেকের লাগেজও।

আপনারা ফ্রেস হয়ে নিন। আমি ঠিক দশটায় আসব। তারপর ক্যানটিনে গিয়ে ডিনার শেষ করা যাবে। অফিসারটি কথা বললেন।

—ধন্যবাদ। বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

মনে হল সবাই অভূতপূর্ব এক নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করে চলেছেন। নীরবে সবাই নিজের নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

অতঃপর ঘড়ির কাঁটা দেখে ডিনার শেষ হ'ল সাড়ে দশটা নাগাদ। আর তার পর মুহূর্তে একটি কালো রঙের অ্যাম্বাসাডোর এসে ঢুকলো অতিথিশালার চত্বরে।

ডিনার শেষ করে বিমান বন্দর থেকে যে অফিসারটির সঙ্গে তাঁরা এসেছিলেন তিনি এগিয়ে গেলেন গাড়িটির সামনে। ততক্ষণে গাড়ির ভেতর থেকে দুজন ভদ্রলোক নেমে এসেছেন। দুজনেরই পরণে সাধারণ নাগরিক পোষাক। তাঁদের মধ্যে একজন লম্বায় প্রায় ছয় ফুট। সুন্দর চেহারা। বয়েস বছর পঁয়তাল্লিশ হবে। সম্ভবত তিনি কমোডোর ব্যানার্জি। কিন্তু তার সঙ্গে— ?

ডঃ পিটার অ্যান্টোনিয়েভিচ্! অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললেন ডঃ বাসু।

টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস তিন-এর জন্য একবার তিনি এসেছিলেন ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে। সেই সময় আলাপ। জীব জগতের ওপর আলোর প্রতিক্রিয়া কি এই নিয়ে কয়েকটি বক্তৃতাও

দিয়েছিলেন। তখন ডঃ বাসুর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল।

না, প্রবীন বিজ্ঞানী—তা এখন বছর ষাটেক বয়েস তো হবেই, ডঃ বাসুর মনে হল যে কেউ একবার দেখলে ও চেহারা কারোর কখনও ভুল হতে পারে না।

কমোডোর ব্যানার্জির সঙ্গে সবাই এসে উপস্থিত হলেন ডঃ রামচন্দ্রনের ড্রইং রুমে। কনফারেন্স বলতে যা, সেটা সেখানেই বসবে।

মিনিট খানেকের মধ্যে অফিসারটি পথ দেখিয়ে সবাইকে ডঃ রামচন্দ্রনের ঘরে নিয়ে এলেন।

অফিসারটি ঘরের বাইরে গিয়ে পাহারা দিতে লাগল।

কোন রকম ভূমিকা না করে একেবারে মিলিটারি কায়দায় কনফারেন্স শুরু করলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

—শুনুন স্যার! একটা অদ্ভুত ঘটনা আমাদের নজরে পড়েছে বলেই আমাদের প্রতিরক্ষা বিভাগকে এমন তৎপর হতে হয়েছে। ব্যাপারটা এই। বলেই কমোডোর ব্যানার্জি টেবিলের ওপর আন্দামান এবং নিকবর অঞ্চলের একটি ম্যাপ মেলে ধরে একটি পেন্সিলের ডগা দিয়ে গ্রেট নিকবরের দক্ষিণে বেনানগা বন্দরটির ওপর দাগ কাটলেন।

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি।

কী যেন ভাবলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

তারপর বোঝাতে লাগলেন: দেখুন দয়া করে। এই হোল বেনানগা। এর আশেপাশে অজস্র দ্বীপ। সোজা দক্ষিণে এদিকটায় হল গিয়ে গ্রেট চ্যানেল। তিন দিন আগে অজ্ঞাত কারণে এখানে হঠাৎ সমুদ্রের জলে ভয়ঙ্কর ধরণের একটি ঘূর্ণি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। মাফ করবেন—আপনারা এখানে যাঁরা রয়েছেন, সবাই যথেষ্ট দায়িত্ব সম্পন্ন। কথাটা এই কারণে বলতে হোল, কারণ এর পরই যা বলব, সেটা একান্ত গোপনীয়। আমি আশা করব, পৃথিবীর স্বার্থে দয়া করে আপনারাও এই গোপনীয়তা রক্ষা করবেন।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, মাফ করবেন, কমোডোর, জানি না কী আপনার গোপন কথা। তবে আমাদের সবার ওপরই আপনি আস্থা রাখতে পারেন।

একটু থেমে কমোডোর ব্যানার্জি আবার শুরু করলেন: আপনাদের দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, তিন দিন আগে ওই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে ভারত সরকারের কয়েকটি মাছধরা লঞ্চ মাঝি মাল্লা এবং কয়েকজন অফিসার সমেত ডুবে গেছে। কেউই প্রাণে রক্ষা পান নি। এ খবরটি আমাদের প্রথমে জানান বেনানগা বন্দরের কর্তৃপক্ষ। তাঁরা রিপোর্টটি পেয়েছেন 'দ্য শার্ক' নামে মালবাহী এক জাহাজের ক্যাপ্টেন হিহং-এর কাছ থেকে। ক্যাপ্টেন হিহং এখন বেনানগাতেই রয়েছেন। পাছে সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে এর জন্যে ওই লোকগুলির ডুবে যাওয়ার খবর এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

সুমিত্রা এতক্ষণ কমোডোর ব্যানার্জির কথা এক মনে শুনে যাচ্ছিল। এবার সে যেন খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠল। বলল, এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ কারোকে জানান হল না?

—একেবারে কারোকেই জানান হয় নি, সে কথা বললে অন্যায় বলা হবে, ম্যাডাম। আসল ব্যাপার, জনসাধারণকে শুধু জানান হয় নি। তবে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করার জন্যে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কাছে খবর পাঠান হয়েছিল। বলতে কি, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি মাদ্রাজে আমার হেড কোয়ার্টাস থেকে বেনানগায় চলে আসি। কিন্তু আশ্চর্য, এখানে এসে প্রতিরক্ষার গুপ্তচরদের কাছে খবর পেলাম, শুধু আমরাই নই, এ ঘটনার ব্যাপারে জানার জন্যে আরও কিছু লোক আমাদের আগেই তৎপর হয়ে উঠেছে। ওই সব লোকের কেউই ভারতীয় নাগরিক নয়। পৃথিবীর তিনটি বিশিষ্ট দেশের নাগরিক। মাফ করবেন, অনিবার্য কারণে, ঠিক এই মুহূর্তে, তারা ঠিক কোন কোন দেশের নাগরিক সে কথা আপনাদের আমি বলব না। ব্যাপার এই ওরা সবাই কেউ প্রকৃতি বিজ্ঞানী, কেউ সমুদ্র বিজ্ঞানী, এই

পরিচয় দিয়ে ভারত সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি পত্র নিয়ে গত ছয় সাত মাস ধরে এ অঞ্চলে বাস করছে। অবশ্য প্রত্যেকেই যে তারা বিজ্ঞানী—সেটা আমরা জানতে পেরেছি। কিন্তু সত্যিকারের কী ধরণের গবেষণা তাঁরা করেছেন, সে ব্যাপারে বিশেষ কোন কৌতূহল আমরাও যেমন প্রকাশ করি নি, তাঁরাও আমাদের জানান নি।

—রীতিমত ডিটেকটিভের গল্প বলে মনে হচ্ছে। মাঝপথে মন্তব্য করলেন ডঃ বাসু।

—তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁদের আচরণটা ওই ধরণেরই ছিল। সন্দেহ বশতঃ কেউ কেউ তাঁদের হয়ত খুনও হয়ে যেতেন, যদি না ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ সময় মত এখানে এসে পড়তেন। ভারত সরকার আমাদের জানিয়েছেন তাঁর কোন অনুরোধ আমরা যেন উপেক্ষা না করি। কমোডোর ব্যানার্জি ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের দিকে চেয়ে একটু মৃদু হাসলেন।

—ধন্যবাদ, কমোডোর। ব্যাপারটা এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরে জেনিভা থেকে দিল্লির প্রতিরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছিলাম সহযোগিতা চেয়ে।

সবাই পুতুলের মত বসে রইলেন। কমোডোর এবং ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ যে কী বলতে চান, কেউ সেটা বুঝতে পারলেন না।

কমোডোর ব্যানার্জি এবার তাঁর পেন্সিলটির ডগা গ্রেট চ্যানেলের একটি জায়গায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন।

—ডঃ বাসু, এই সেই জায়গাটি, যেখানে সেই রাক্ষুসে ঘূর্ণিটি দেখা গিয়েছিল।

—মাফ করবেন কমোডোর। একটি নয়, দুটি ঘূর্ণি পাশাপাশি গজিয়ে উঠেছিল। বললেন, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ্।

—ঠিক কথা। দুটি ঘূর্ণির কথাই আপনি আজ বিকেলে আমাকে বলেছিলেন বটে। আসলে, ঘূর্ণিটুর্ণির ব্যাপারে আমার তত

ইনটারেস্ট নেই কী না? ওসব সমুদ্র বিজ্ঞানের কথা। বিজ্ঞানীরা ওদের ব্যাপার ভেবে দেখুন।—মানে—

কমোডোরকে শেষ করতে না দিয়ে ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ বলে উঠলেন, দাঁড়ান, ছবিটা এঁদের একবার দেখিয়ে নিই।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ্ তাঁর ব্রিফ কেসটি খুলে বের করলেন একটি বড়োসড়ো খাম। খামের ভেতর থেকে বের করলেন। প্রায় দশ ইঞ্চি লম্বা এবং আট ইঞ্চি চওড়া একটি ফোটোগ্রাফ। ফটোটি তিনি টেবিলের উজ্জল আলোর সামনে মেলে ধরতেই ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

—এই সেই দুই ঘূর্ণি। মার্কিন মহাকাশযানের ইনফ্রারেড রশ্মি ক্যামেরায় তোলা। বললেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ দত্ত—তাঁদেরও চোখ যেন ছানা বড়া।

সত্যিই যেন বিশ্বাস করা যায় না।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন ডঃ বাসু। সাফল্যের আনন্দ। অনুমানের ওপর নির্ভর করে তিনি এবং সুমিত্রা সমুদ্রের বুকে যে দুটি ঘূর্ণির চেহারা কল্পনা করেছিলেন—তাদের সঙ্গে বাস্তব দুটি ঘূর্ণির চেহারা যে এভাবে মিলে যাবে এ কথা তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

ডঃ বাসু বললেন, কৃতিত্ব সুমিত্রার। আমি তাকে শুধু কতকগুলি ডেটা দিয়েছিলাম। তারই ওপর নির্ভর করে অঙ্ক কষে সুমিত্রা আমাদের মডেল ছবি দুটি তৈরি করেছে।

সুমিত্রার পিঠে আনন্দের আতিশয্যে মৃদু করাঘাত করলেন তিনি।

না, না। তা কেন? আপনি যদি—কি যেন, বলতে গিয়ে থেমে পড়ল সুমিত্রা।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ্ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল।

কিন্তু সবই তাৎক্ষণিক ঘটনা।

কমোডোর ব্যানার্জী বলতে শুরু করলেন।

—দয়া করে আমি যা বলি ধৈর্য ধরে একটু শুনুন। ব্যাপারটা এই। মৎস বিভাগের অনুরোধে গতকাল সেই হতভাগ্য লঞ্চগুলির মাল্লা এবং অফিসারদের মৃতদেহ উদ্ধার করার জন্যে একটি ডুবো জাহাজে চড়ে কয়েকজন টেকনিকেল কর্মীদের নিয়ে আমি অকুস্থলে গিয়েছিলাম। কোন ভুতুড়ে ঘূর্ণিই আমরা দেখি নি। ডুবো জাহাজকে—ঠিক যেখানটায় ঘূর্ণি দেখা গিয়েছিল। বলে 'দ্য শার্ক' জাহাজের ক্যাপ্টেন খবর দিয়েছিলেন—সেখানে নিয়ে গিয়ে আমরা ডুব মেরে ছিলাম। অনেক গভীরে নেমেও গিয়েছিলাম, কিন্তু না সেই সব লঞ্চ, না সেই হতভাগাদের একজনকেও শ্যেন দৃষ্টি ধরতে পারে নি।

—দয়া করে একটু সবুর করুন, কমোডোর। তার আগে বলুন দেখি, ঠিক কোন জায়গায় সমুদ্রের গভীরে একেবারে মাটি ঘেঁষে আপনারা অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন? ডঃ দত্তর প্রশ্ন।

কমোডোর ব্যানার্জী পেন্সিলের ডগা দিয়ে ম্যাপের ওপরে জায়গাটি দেখালেন।

কমোডোরের কথায় ডঃ দত্ত চমকে উঠলেন।

বললেন, আমি যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না; কমোডোর ব্যানার্জী। দয়া করে আর একবার বলুন তো। ম্যাপের ওপর পেন্সিল দিয়ে যে জায়গাটা আপনি দেখালেন, সত্যিই ওই জায়গায় ডুবো জাহাজ নিয়ে আপনারা নেমেছিলেন? আশা করি এ প্রশ্নের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, কমোডোর।

ডঃ দত্তের প্রশ্নের প্রথম অংশ শুনে জাঁদরেল মিলিটারি অফিসার কমোডোর ব্যানার্জী একটু রেগেই উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর পরের বিনয় বিজড়িত অংশটুকু সে রাগের ওপর বৃষ্টির জল ঝরাল।

—ভাল কথা। আচ্ছা—সমুদ্রের নিচে মাটির বুকে সেখানে কিছু কিছু খালও কি আপনারা দেখেন নি? মানে, আমি বলতে চাইছি, এমনও তো হতে পারে—সেই সব ভরাডুবি লঞ্চ এবং তাদের

আরোহীরা ডুবে গিয়ে ওইসব খালের মধ্যে গিয়ে পড়ে থাকতে পারে। অনেকেই তো জানেন, পৃথিবীর বহু সাগর মহাসাগরের গভীরে মাটির বুকে অজস্র খাল বা হ্রদের মত গহ্বর রয়েছে। বললেন ডঃ দত্ত।

—না। কোন খালই আমরা দেখিনি। বরং বেশ উঁচু একটা পাহাড়ের মত জয়গা বলেই তো আমাদের মনে হয়েছে ডঃ দত্ত ?

—পাহাড় ? দাঁড়ান, দাঁড়ান, ঠিক কোথায় বলুন তো ?

—এখানে। ম্যাপের ওপর পেন্সিল দিয়ে জায়গাটা দেখালেন কমোডোর ব্যানার্জী।

ডঃ দত্ত পকেট থেকে ছোট একটি স্কেল বের করলেন। তারপর মিনিট পাঁচেক ধরে স্কেল ফেলে ম্যাপের সেই জায়গাটা মাপলেন। বললেন—অসম্ভব! এখানে কোন পাহাড় থাকতে পারে না।

—আমাদের কোন ভুল হয় নি, ডঃ দত্ত। পাহাড় আমরা দেখেছি এবং একটি নয়। আরও চারটে। সমুদ্রেব গভীরে তারা যেন এক একটা পিরামিড। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে। এক একটির উচ্চতা প্রায় দু'শো ফুট। কতকটা দৃঢ়তাব সঙ্গে এবার কথা বললেন কমোডোর।

—আপনার কথা শুনে আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, গত পনের বছর সমুদ্রের এই অঞ্চলে আমি মাছের মত ডুবে বেড়িয়েছি। এখানকার প্রতিটি পাথরের টুকরো আমাব পরিচিত।

—শুনুন, মশায়। কমোডোর ব্যানার্জির কণ্ঠে এবাব কর্তৃত্বের সুর। —ঢিবি, কি পাহাড়—সে সব নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। যার জন্যে প্রতিরক্ষা দপ্তর বিচলিত, সেটা এই। সমুদ্রের গভীরে ক্রুজ করার সময় ওই পাহাড়েবই একটি জায়গায় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাই।

—কী রকম ? প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

একটু লাল আলো। আলোটি জ্বলছিল, নিবছিল। দাঁড়ান —আমার কথা আগে শেষ করি। তারপর আপনারা আমায় প্রশ্ন

করবেন। আলোটি দেখে নেভিগেটের ডুবো জাহাজটিকে এক জায়গায় দাঁড় করাল। সবাই দেখলাম সমুদ্রের গভীরে গাঢ় অন্ধকার। একবার ভাবলাম, হয়ত কোন জলজ প্রাণী। ওই আলো তারই গা থেকে বেরোচ্ছে।

কিছু দূর এগিয়েছি, দেখলাম, সেই চারটে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে ইলেকট্রিক কেব্‌ল। ভাবুন ব্যাপারখানা। দরিয়ার নিচে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কেব্‌ল। এমন একটা খবর আমরা রাখি না। অথচ আমাদের ওপর সমুদ্রের এই অঞ্চলটিতে প্রতিরক্ষার সব কিছু দায়িত্ব ছেড়ে দেয়া হয়েছে? তবে কি কোন বিদেশী রাষ্ট্র সমুদ্রের নিচে কোন ঘাঁটি তৈরী করেছে? একথা যখন ভাবছি, দেখলাম, সেই আলো হঠাৎ যেন নিভে গেল। আমি সঙ্গে সঙ্গে পাইলটকে বললাম, এখান থেকে এখুনি আমাদের ঘাঁটিতে ফিরে চল।

আন্দামানের সরকারী অতিথিশালার নিস্তব্ধ পরিবেশে চারজন বিজ্ঞানী যেন এক একটি পুতুল। কমোডোর ব্যানার্জি কথা বলছিলেন। আর সবাই পাথরের অনড়তা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলি শুনে যাচ্ছিলেন।

—শুনুন তাহলে মশায়রা, হ্যাঁ, ম্যাডাম আপনিও। সুমিত্রার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন কমোডোর। —ঘাঁটিতে ফেরার পর ব্যাপারটা দিল্লির প্রতিরক্ষা দপ্তরে জানাই। ওঁরা উত্তরে জানালেন খবর রাখুন। সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান চালিয়ে যান। তেমন কিছু দেখলে অস্ত্র ব্যবহার করতেও পিছুপা হবেননা।—আমি ঠিক করেছিলাম, আজ দুপুরের দিকেই অপারেশন চালাব। এমন সময় খবর এল—সবুর করুন। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ্ যাচ্ছেন। ভয়ের কোন কারণ নেই। বাঙ্গালোর থেকে ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ বাসু এবং ডঃ সুমিত্রা মালহোত্রাকে পাঠান হচ্ছে। ওঁদের ওপর আমরা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছি। ওঁরা আন্দামানে যাচ্ছেন আজ রাতে। কলকাতার ডঃ অশোক দত্তকে খবর পাঠান হয়েছে। প্রতিরক্ষা

দপ্তরের হয়ে তিনিই সমস্ত কিছু দেখেশুনে রিপোর্ট করবেন। যে সব নির্দেশনামা আমার কাছে পাঠান হয়েছে, তা হল--যতদূর সম্ভব, অ্যাণ্টোনিয়েভিচের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যেন কাজ করি। দ্বিতীয়তঃ ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ ইতিমধ্যে দিল্লীতে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে বিদেশী হওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার তাঁকে ডিফেন্সের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে—দেখতে হবে, তাঁর সেই রিপোর্টের সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধানলব্ধ তথ্যাবলীর মিল আছে কিনা। তৃতীয়তঃ অনুসন্ধানের কাজটি গোপনে সারতে হবে।

শুনুন স্যারস্, কাল ভোর সাতটায় এখান থেকে আমরা বেনানগায় যাব। সেখান থেকে গ্রেট চ্যানেলের সেই অকুস্থানের উদ্দেশ্যে। রাতের মত আপনারা বিশ্রাম করুন।

সত্যিকথা বলতে কী, মাত্র তিন চার দিনের মধ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল, আর এক এক জন মানুষের ওপর তাদের প্রতিক্রিয়া এক এক রকম। কনফারেন্স সেরে যে যাঁর শোবার ঘরে ফিরে গেলেন বটে, কিন্তু সারা রাত কারোর বুঝি চোখে ঘুম এল না।

প্রবীণ বিজ্ঞানী ডঃ রামচন্দ্রন ভাবছিলেন, সব কিছুই দারুণভাবে জট পাকিয়ে গেছে। সমুদ্রের গভীরে পাহাড়ের বুকে লাল আলো। ইলেকট্রিক কেবল খাটানো। যে দেশের মানুষই সে সব করে থাক না কেন, যারা করেছে তারা যথেষ্ট কৃতিত্ব রাখে।

ডঃ অশোক দত্ত ভাবছিলেন, কমোডোর ব্যানার্জি যা বললেন, সেটা সত্যি তো? ভাবছেন, সমুদ্রের গভীরে একেবারে মাটির বুকে সেই লম্বা নালার মত গর্তগুলির কথা। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ওই সব অঞ্চলেই তো তাঁর চব্বিশ ঘণ্টা কাটত। প্রতিরক্ষা দপ্তরের রিপোর্ট, পাকিস্তান সমর বিভাগ বঙ্গোপসাগরের বিস্তীর্ণ

এলাকায় মাইন পেতে রেখেছে। সম্ভাব্য সেই সব মাইন উদ্ধার করতে বা মাইনের খোঁজে জলের ওপরে নয়, গভীরে, একেবারে সি বেডের ওপর তাঁকে দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। গ্রেট চ্যানেলের যে জায়গাটির কথা কমোডোর বললেন, সেখানেও ঘুরেছেন। সেখানে অনুচ্চ ঢিবির মত ভূ-স্তবেব সজ্জা। অজস্র জলজ উদ্ভিদ। বিচিত্র রকমের মাছের ভীড়। আর সেই সব নালার মত গর্তের মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই। দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ডঃ দত্ত। আরও একটি কথা মনে পড়ে মুহূর্তে যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কমোডোর বললেন, ভরাডুবী লঞ্চ এবং তাদের আরোহীদের খোঁজে ওই অঞ্চলে তিনি নাকি ডুবো জাহাজে করে নেমেছিলেন। আশ্চর্য ! এই সময়ে সেখানে জলেব গভীরে মাঝে মাঝেই চোরা স্রোত দেখা যায়। যাদের আবর্তে পড়ে ওই জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারত। এ ঝক্কিটা ধাঁ করে নেয়া, অন্ততঃ বিশেষজ্ঞদেব সঙ্গে কথা না বলে—কমোডোরেব মোটেই উচিৎ হয় নি।

ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা সামনেব করিডোরে বেতের চেয়ারে এসে বসলেন কিন্তু দুজনেই নিশ্চুপ। তাঁরা ভাবলেন, কী অদ্ভুত ব্যাপাব। প্রথম শুরু বাঙ্গালোবের সেই ভূ-কম্পনজ্ঞাপক যন্ত্র থেকে। পৃথিবীটা সজোরে কেঁপে উঠল, হঠাৎ মনে পড়ল ডঃ নিগুচির কথা। অবশেষে তাঁকে কেন্দ্র করে একের পর এক—বলতে পারেন শুধু কল্পনাব ওপর নির্ভর করেই তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। সব কিছুব জন্যে দায়ী ডঃ নিগুচি। তবে একটা প্রশ্ন। সমব মুখার্জির সঙ্গে ডঃ নিগুচির সম্পর্কটা কী ? কী ভাবে সে তাঁকে সাহায্য কবেছে ?

সুমিত্রা বলল, রাত অনেক হোল। এবাব ঘুমতে যান ডঃ বাসু।

ধন্যবাদ, সুমিত্রা।

সুমিত্রা অপলক দৃষ্টিতে ডঃ বাসুর যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে রইল, যতক্ষণ না তিনি নিজের ঘরে ঢোকেন ততক্ষণ পর্যন্ত। মাত্র কয়েক মাসের পরিচয়ে সত্যি যেন এক গভীর

অন্তরঙ্গতার স্বাদ গড়ে উঠেছে সুমিত্রার মনে। ডঃ বাসুকে তার কাছে মনে হয়—এ যেন এক পাগল—সৃষ্টিছাড়া—নিজের কাজের মধ্যে কেউ এভাবে এত সহজে ডুবে যেতে পারে তাঁকে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হ্যাঁ, আরও একজন। কমোডোর ব্যানার্জি। খাস নৌ-অফিসার কমোডোর ব্যানার্জি কনফারেন্স শেষ করে কতকটা আবিষ্টের মতই নিজের গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

ডঃ দত্ত যে গভীর খালের কথা বললেন, সাবমেরিনে চড়ে অনুসন্ধান করার সময় তেমন কিছু তিনি দেখতে পেলেন না কেন? সেই লাল আলো, ইলেকট্রিক কেব্‌ল—এবং শেষ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচকে সাহায্য করার নির্দেশ। তাঁর কাছে মনে হল এ সবই যেন হেঁয়ালি, একান্ত হেঁয়ালি।

সবাইকে বিশ্রাম করতে বলে কমোডোর ব্যানার্জি চলে গেলেন। আর একে একে বিজ্ঞানীরা এসে আশ্রয় নিলেন নিজ নিজ শোবার ঘরে। একটা অদ্ভুত আবেশ সবাইকে আচ্ছন্ন করে রইল। যদি কেউ তাঁদের দেখতেন, মনে হত, তাঁরা এক একজন যেন এক অশরীরি আত্মা। অথবা যাদুকরের সামনে দাঁড় করান সম্মোহিক কয়েকজন মানুষ।

নিজের বিছানায় শুয়ে ভাবছিলেন ডঃ বাসু।

হাত ঘড়ি দেখলেন। কয়েকবার।

হ্যাঁ, ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

এক একটি সেকেণ্ড যেন এক একটি হাতুড়ির ঘা।

রাত তখন দুটো।

এ পর্যন্ত গত কয়েকদিন প্রতিটি মুহূর্ত এত ব্যস্ততায় কেটে গেছে

যে, ডঃ বাসু ভুলেই গিয়েছিলেন নিজের অস্তিত্ব।

কিন্তু এইবার, ঠিক এই মুহূর্তে, স্বপ্ন ভাঙ্গা। মানুষ হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে চমকে ওঠে, তেমনই একটি চমক যেন খেলে গেল ডঃ বাসুর সমস্ত শিরা উপশিরার মধ্যে দিয়ে। এ যেন অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ হাজার পাওয়ার আলোর ঝলসানি। অতীতের কয়েকটি ছোট্ট ঘটনা। তখন মনে হয়েছিল খড়কুটো। কিন্তু এখন — ?

ভাবতে গিয়েই আর একবার চমকে উঠলেন তিনি।

অলীক। পাগলের কল্পনার মতই তো মনে হয়েছিল তখন।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে সব কথা তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন, তার সব কিছুই হয়ত বাস্তব ঘটনা।

বিছানা ছেড়ে উঠে বসলেন ডঃ বাসু।

মনে হল এবার তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। অদ্ভুত তালগোল পাকান চিন্তার ঝড় তাঁর সমস্ত মগজটাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল।

উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখার জন্যে দেরাজ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে সিগারেট ধরালেন। আর একে একে মনে পড়তে লাগল গত দশ বছরের পুরনো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা।

সেই ডেভিডের গল্প। সেই জেলের মুখে শোনা সাগরের বুকে ঘোরাফেরা করা অদ্ভুত-কাহিনী। এবং ক্যাপ্টেনের রিপোর্ট।

ডঃ বাসুকে বছরে কয়েকবার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে মাঝে মাঝেই আন্দামান এবং নিকবর দ্বীপপুঞ্জে আসতে হয়। বিশেষ করে গত পাঁচ বছর ধরে এ ব্যাপারটা তো কতকটা রুটিনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুসন্ধান বলতে, এই অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলির ওপর ভূকম্পন বিষয়ক অনুসন্ধান। উদ্দেশ্য, একটি পুরনো তত্ত্বকে আরও বেশি করে সমর্থন করার মত তথ্য সংগ্রহ।

তত্ত্বটা পুরনোই বটে। অনেকের ধারণা পৃথিবীর বুকে মাঝে মাঝে যে প্রচণ্ড ভূকম্পন ঘটে, তার চাবি কাঠি পড়ে রয়েছে বিশেষ বিশেষ এক একটি অঞ্চলে। রহস্য জনক কারণে এই সব জায়গায়

ঘটে প্রথম আলোড়ন। সেই আলোড়ন নির্দিষ্ট পথ ধরে ছড়িয়ে যায় পৃথিবীর দূর দূরাঞ্চলে যেমন পাহাড়ে নদি নির্দিষ্ট পথ ধরে এগিয়ে যায় সমুদ্রের দিকে, অন্য কোন নদী অথবা হ্রদের উদ্দেশ্যে।

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ঠিক ওই ধরণের একটি অঞ্চল। এখানকার উৎস থেকে ভূকম্পন যাত্রা করে এগিয়ে যায় ভারতীয় পূর্বাঞ্চলের পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে, হিমালয়কে আন্দোলিত করে সোজা উত্তর পশ্চিমে বেলুচিস্তান, মধ্য প্রাচ্যে। অবশেষে ইউরোপের আলপস পর্বতমালায়। পথে তার প্রভাব আন্দামান নিকবর দ্বীপপুঞ্জেও ধাওয়া করে। আর ওই সময় ওই সব অঞ্চলের বাতাসের তাপ মাত্রায় হঠাৎ খানিকটা পরিবর্তন ঘটে। ওরিবর্তন ঘটে বাতাসের চাপে। এমন কি কোথাও ভূকম্পন ঘটার আগে অদ্ভুত এক ধরণের শব্দ শোনা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন বাতাসের এই তাপমাত্রা এবং চাপের পরিবর্তন, আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত সেই শব্দের গতিপ্রকৃতি দেখে ভবিষ্যতে কখন কোথায় ভূকম্পন ঘটতে পারে ঠিক আবহাওয়ার পূর্বভাষের মত আগে থেকেই তা জানিয়ে দেয়া যাবে। সে ক্ষেত্রে হয়ত বহু মানুষের জীবন রক্ষা সম্ভব হবে। সেই সঙ্গে সম্ভব হবে অনিবার্য ধ্বংসের হাত থেকে প্রচুর সম্পত্তি রক্ষা করা।

গত কয়েক বছর এসব নিয়ে সূক্ষ্ম তথ্য সংগ্রহের জন্যে বহুবার ডঃ বাসু এখানে এসেছেন। ওই সময় কাজের অবসরে আড্ডা জমত। সেই আড্ডায় যোগ দিতেন এখানকার সরকারী অফিসাররা। তাঁদের মুখেই তো সেই সব গল্প শোনা।

ডঃ বাসুর মনে পড়তে লাগল প্রত্যেকটি গল্প একের পর এক। আর মনে হল যাদের পুরোপুরি হেঁয়ালি বলে মনে হয়েছিল, সত্যিই কি তারা তাই?

ডেভিডের গল্পটা কি ছিল যেন?

মনে পড়েছে।

লোকটি বেপরোয়া ডুবুরী। অকসিজেনের মুখোশ মুখে এঁটে সে

নাকি সাগরের অতলে তলিয়ে যেতে পারে। তার মগজ পরিষ্কার। সে মিথ্যে কথা বলে না।

সেই ডেভিডই তো বলেছিল, সমুদ্রের নীচে বড়দিনের মোচ্ছব। আলোর রোশনাই চলেছে সেখানে। রঙ-বেরঙী আলো। সে সব আলো যে মাছের নয়, ডেভিড জানে। তার মত ঝানু জেলের এ সব ব্যাপারে ভুল হতে পারে না।

প্রায় এক মিনিট ধরে আলোগুলি জ্বলতে দেখেছে ডেভিড। তারপর তারা নিভে গেছে। নিভে যদি নাও গিয়ে থাকে তারা, অন্তত অদৃশ্য হয়েছে।

না। একবার নয়। তার কথা কেউ হয়ত বিশ্বাস করে নি তখন। তবে ডেভিড পরে আরও কয়েকবার সেই একই জায়গায় ওই একই দৃশ্য দেখতে পেয়েছিল। দু একজন ছাড়া আর কাউকে এ কথা সে আর বলে নি।

মহিম মিঞা এই দু একজনের মধ্যে একজন।

মুহূর্তে মহিম মিঞার মুখখানি ভেসে উঠল ডঃ বাসুর মানসপটে।

বুড়ো সেই সারেং-এর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল বছর চার আগে। বেলানগায়। বেলানগা থেকে যে পাইলট লঞ্চটিতে চড়ে সেবার নিকবরের কয়েকটি দ্বীপে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল, সেই লঞ্চটিরই সারেং ছিল মহিম মিঞা।

লোকটি আমুদে এবং গল্পবাজ।

তার সঙ্গে মুহূর্তেই ডঃ বাসু ভাব জমিয়ে নিয়েছিলেন।

মহিম মিঞাই তাঁকে বলেছিলেন ডেভিডের বৃত্তান্ত।

শোনেন সাহেব, ডেভিড আমার ইয়ার হতে পারে, কিন্তু তার বেবাক কথাই সত্যি। এ আমি আল্লার কসম নিয়ে বলতে পারি, জনাব। দরিয়ার নীচে রোশনাই, হাজার রোশনাই। ডেভিড যখন দেখেছে, এ কখনও ভুল হতে পারে না।

ডঃ বাসু মহিম মিঞার গল্প খুব কৌতূহল নিয়েই শুনেছিলেন তখন।

আর মনে মনে ভেবেছিলেন, জাহাজী মাল্লারা আজগুবী বিশ্বাসও করতে পারে এত।

কিন্তু এই মুহূর্তে, আন্দামানের এই লজে বসে রাত দুটোর সময় তাঁর যেন মনে হল, মহিম সেদিন যা বলেছিল, সত্যিই কি তার সবটা আজগুবী ?

জায়গাটা কোথায় যেন ?

তাইতো।

সমুদ্রের চোখ।

হ্যাঁ, যে জায়গাটায় সেদিন সমুদ্র তার দু চোখ বাড়িয়ে পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিল, যে দৃষ্টি কৃত্রিম উপগ্রহের ক্যামেরায় ধরা পড়েছে, ডেভিড যেখানে রোশনাই দেখেছিল, জায়গাটা ঠিক তার কাছে বলেই তো মনে হচ্ছে ?

মুহূর্তে আরও একটি গল্প মনে পড়ল ডঃ বাসুর।

সেই জেলেটা।

সে নাকি বিটকেলে কী সব প্রাণী সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখেছে। দেখতে মাছের মত হলেও তারা মাছ নয়। তাদেরও গা দিয়ে অদ্ভুত রকমের আলো নাকি দেখা গিয়েছিল।

ঠিক।

জেলেটি যে জায়গায় তাদের দেখতে পেয়েছিল সে জায়গাটিও তো দেখছি সেই সমুদ্রের চোখেরই কাছ বরাবর।

অদ্ভুত !

কি দেখেছিল সে ?

মাছ ?

না। মাছ হবে কি করে।

আলোগুলি নাকি সমুদ্রের বুক থেকে কিছুটা উঁচুতে দেখা গিয়েছিল। আর তা যদি হয়, হলফ করে বলা চলে মাছ তারা হতেই পারে না।

আবার চমক।

মারাত্মক কথা বলেছেন সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন।

না। তাঁর বক্তব্য নেহাৎ গালগল্প বলে কেউই উড়িয়ে দিতে পারে নি।

বিবরণটা কি যেন ছিল সেই ক্যাপ্টেনের?

মনে পড়েছে। জাহাজ থেকে দূরে সমুদ্রের বুকে জলের ফোয়ারা।

এমন নয় যে আকাশে মেঘ করেছিল। ঘূর্ণি ঝড়ও ওঠেনি তখন যে, হঠাৎ সাগরের বুকে জলস্তম্ভ দেখা দেবে।

নাটকীয় সেই ফোয়ারা।

সমুদ্রের বুক থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিল। ক্যাপ্টেন নাকি প্রায় এক মিনিট ধরে তাকে দেখতেও পেয়েছিলেন। পরে এই ঘটনার যে বিবরণটি তিনি দাখিল করেছিলেন তাতে সই ছিল কম করেও দশজন নাবিকের। তার মানে তারাও ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী।

এ নিয়ে পরে নাকি অনুসন্ধানের কাজও চালান হয়।

কেউ কেউ অনুমান করেছিলেন, ক্যাপ্টেন যেখানে সেই ফোয়ারাটি দেখতে পেয়েছিলেন, হয়ত সেখানে সমুদ্রের নিচে একটি ডুবো আগ্নেয়গিরি আছে। হতে পারে, আগ্নেয়গিরিটি ছিল নিষ্ক্রিয়। হঠাৎ সেটা জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারপর শুরু হয় বিস্ফোরণ। বিস্ফোরণের ফলে তার মাথার অংশ উড়ে যায়। ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে উচ্চ চাপের গ্যাস। সেই গ্যাসই সাগরের বুক ফুঁড়ে ফোয়ারা সৃষ্টি করে থাকবে।

কিন্তু প্রশ্ন তুলেছিলেন আবার কেউ কেউ।

কি করে তা সম্ভব?

সমুদ্রের নিচে ডুবে থাকা একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠল। তার বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের ফলে তার মাথা উড়ে গিয়ে ভেতর থেকে গ্যাস বেরিয়ে ফোয়ারা সৃষ্টি করল। এ পর্যন্ত সব কথাই

যুক্তি সঙ্গত বলা যেতে পারে।

কিন্তু তাই বলে আর যা কিছু ঘটার সম্ভাবনা ছিল কিছুই তার ঘটল না, এটা কি করে সম্ভব ?

তার মানে ? একজন বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন তুলেছিলেন।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন তোলা হয়। বলা হয়, তেমন কিছু ঘটনা ঘটলে আশপাশের সমুদ্র কি স্থির হয়ে থাকতে পারত ? নিশ্চয় সেখানে শুরু হত প্রচণ্ড আলোড়ন। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে উঠত। সে ক্ষেত্রে সেই ক্যাপ্টেনের জাহাজটাও রক্ষা পেত কি না, বলা শক্ত।

ঠিক কথা। এবার প্রশ্ন তুললেন আর একজন বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, ক্যাপ্টেনের বিবররণে দেখা যাচ্ছে তিনি শুধু ফোয়ারার কথাই বলছেন। কিন্তু আশপাশের জলে কোন রকমের বড় বড় ঢেউ অথবা অন্য কোন রকম বিক্ষোভ ঘটেছিল কিনা, সে কথা তিনি বলেন নি। আর তা যদি হয়, আগ্নেয়গিরির ব্যাপারটা এ ক্ষেত্রে যুক্তি তর্কের ধোপে টেকে কি ?

এ ক্ষেত্রেও যুক্তি দেখিয়েছিলেন আর একজন বিশেষজ্ঞ।

তিনি বললেন, তা কেন ফুলকো লুচি যেমন গরম ঘি-এর ওপর ফুলে ফেঁপে উঠে হঠাৎ এক যায়গায় ফেটে যায়, তখন তার ভেতর থেকে গরম গ্যাস একটি নির্দিষ্ট চাপের তোড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে, ঝলকে ঝলকে নয়, এক টানা—এ ক্ষেত্রেও হয়ত তেমন কিছু ঘটে থাকবে। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরির ডগা উড়ে গেল। বেরিয়ে এল উচ্চ চাপের গ্যাস। সেই গ্যাসের চাপে সমুদ্রের বুকটা ফেঁপে উঠে তৈরি করল সুনামে। অর্থাৎ এক ধরণের ঢেউ। যা একশ' ফুট উঁচু হতে পারে। আর যার তরঙ্গ দৈর্ঘ দু'শ মাইলেরও বেশি। এ ধরণের ঢেউ-এর মাঝখানে কোন জাহাজ পড়লে জাহাজীরা বুঝতেই পারে না যে, তারা সর্বনেশে এক ঢেউ-এর ওপর চড়ে নেচে চলেছে। কারণ ঢেউ-এর মাঝের অংশটি সাধারণভাবে স্থির রয়েছে বলে মনে হয়। বরং এর

তাণ্ডব ধরা পড়ে দূরের উপকূলবর্তী কোন অঞ্চলে। সেখানে পাহাড়ের মত একটি ঢেউ আছড়ে পড়ে মুহূর্তে মানুষ, গাছপালা, ঘরবাড়ি সাফ করে দিয়ে যায়।

ভদ্রলোকের দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে জনৈক সদস্য মন্তব্য করেছিলেন, প্রিয় বিশেষজ্ঞ, দোহাই আপনার। আপনার তত্ত্বটি এ ক্ষেত্রে চমৎকার। কিন্তু শুনে দুঃখিত হবেন, আন্দামান এবং নিকবর তো দূরের কথা, ওই যে, আপনি বললেন না, উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়া—যতদূর আমি জানি, ওই সময় তেমন কোন ঘটনা আদৌ কোথাও ঘটে নি। অন্ততঃ আমাদের মান মন্দিরগুলির নথি-পত্র দেখে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

এরপর আর কোন কথা বলেন নি।

তবে সত্যিই সেখানে আগ্নেয়গিরি আছে কিনা সেটা জানার জন্যে অনুসন্ধান চালান হয়েছিল। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিল তাঁরা। সমুদ্রের গভীরে সেখানে পাহাড় আছে বটে। কিন্তু ন্যাড়া পাহাড়। তাদের কেউ-ই আগ্নেয়গিরি নয়। আর শেষ পর্যন্ত ফোয়ারার রহস্যটা রহস্যই থেকে যায়।

ডঃ বাসুর মনে হল, সমুদ্রের চোখ এবং এই ফোয়ারার জায়গাটার দূরত্বের মধ্যে ব্যবধান যেন অনেক কম।

এবার আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডঃ বাসু।

এমনভাবে ব্যাপারটা নিয়ে কখনও তিনি ভাবেন নি?

তাহলে সমুদ্রের চোখ এবং এই সব ঘটনার মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই তো?

কথাটা মনে হতেই চঞ্চল হয়ে উঠলেন ডঃ বাসু।

প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁর সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

রাত কত?

ইস্! তিনটে বেজে গেছে।

অথচ এক মিনিটের জন্যেও তিনি ঘুমতে পারলেন না।

ঘুম আর আসবেও না হয়ত।

কথা বলবেন কারোর সঙ্গে এসব নিয়ে।

কিন্তু এত রাতে কার সঙ্গেই বা কথা বলবেন? তা ছাড়া, ঘটনার ঢেউ অনেকদূর গড়িয়েছে। শুধু বিজ্ঞানীরা হলে কথা ছিল। এখন এর মধ্যে এসে পড়েছে দেশের প্রতিরক্ষা দপ্তর। ওদের অফিসারদের সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলার কোন মানে হয় না। ওঁরা বুঝবেও না এ সব। সেনাদপ্তরের লোকেরা বাঁধা ছকে চলতে অভ্যস্ত।

ডঃ এ্যান্টোনিয়েভিচ। এসব খবর তিনি কি রাখেন?

ডঃ বাসু ভাবলেন, অন্তত: এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে হয়ত কিছুটা আলোচনা করা যায়। কিন্তু তিনিও তো ঘুমচ্ছেন এখন?

না। ডঃ বাসুর ধারণা ঠিক নয়।

তিনি জানতেন না, প্রবীন বিজ্ঞানী ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ নিজের ঘরে সারা রাত পায়চারি করে চলেছেন। একান্ত আত্মমগ্ন। যেন সমাহিত এক আত্মা।

রাত তখন তিনটে বেজে পনের।

হঠাৎ ডঃ বাসুকে চমকে দিয়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

এত রাতে টেলিফোনের কল?

মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোনের রিসিভার কানে চেপে ধরলেন ডঃ বাসু।

—হ্যলো। ডঃ বাসু হেয়ার।

—একসকিউজ মি, ডঃ বাসু! কথা বলছেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। —আমি দুঃখিত। অত্যন্ত জরুরী একটি ব্যাপারে তোমাকে বিরক্ত করতে হল। তোমার ঘুমের ব্যাঘাত করলাম। তার জন্যে তোমার বুড়ো শিক্ষককে ক্ষমা করো।

—না, না। ওসব ক্ষমা টমা আপনি ছেড়ে দিন। আমি মোটেই

ঘুমোই নি। বরং আপনার কথাইতো এই মাত্র ভাবছিলাম। কতকগুলি কথা আপনাকে বলা দরকার, ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ। এতদিন সে সব কথা মনেও পড়েনি। গোড়ায় ভেবেছিলাম এসব আজগুবী। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, মোটেই তা নয়।—

—দাঁড়াও। টেলিফোনে এত কথা হয় না। এতক্ষণ আমিও তোমার কথা ভাবছিলাম। তুমি আমার ছাত্র। এখানে একমাত্র আপনজন। হয়ত তোমাকেই সব কিছু খুলে বলা চলে। তোমার ঘরে একবার আসব? কথা বললেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ। তাঁর কণ্ঠেও উত্তেজনা।

—আমিই বরং আপনার ঘরে যাচ্ছি, স্যার।

—ও! ইউ আর টু পোলায়েট! ধন্যবাদ।

ডঃ বাসুর ঘরের পর আরও দুখানা ঘর পেরলেই ডঃ অ্যাণ্টো-নিয়েভিচের ঘর।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি গিয়ে হাজির হলেন।

—কাম অন ইন! দরজায় টোকা মারতেই ভেতর থেকে ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের গলার স্বর শোনা গেল।

ডঃ বাসু ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন।

কিন্তু একি দেখছেন তিনি।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ চিরদিনি ধীরস্থির। কখনও তিনি উত্তেজিত হতে পারেন, এ যেন ভাবা যায় না। অথচ সেই মানুষটির এমন অবস্থা কেন।

ডঃ বাসু দেখলেন, রাতে বিদায় নেবার সময় যে পোশাক তিনি পরেছিলেন, এখন সেই পোশাকেই রয়েছেন। তাঁর সারা মুখে ক্লান্তি এবং দুর্ভাবনার ছাপ এত স্পষ্ট যে ভয় পেয়ে যেতে হয়।

তা না হয় হল। কিন্তু এ সবই বা কি দেখছেন ডঃ বাসু?

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের খাটের ওপর কাগজপত্র ছড়ান। কয়েকটি খাতা। কলম পেন্সিল, আর একটি ম্যাপ। যে জায়গাটির উদ্দেশ্যে

সবাই চলেছেন সেখানকারই মানচিত্র।

সেই মানচিত্রের মাঝখানে অসংখ্য দ্বীপ। লাল নীল পেন্সিল দিয়ে বিভিন্ন দ্বীপের মাথায় ফুটকি কাটা হয়েছে। অথবা আঁকা-বাঁকা দাগ কাটা। আর তাদের মাঝখানে—হ্যাঁ, ওই তো। পাশাপাশি দুটি বৃত্ত। আর প্রত্যেকটি বৃত্তের মাঝখানে একটি করে এক ইঞ্চি ব্যাসের কেন্দ্র।

সমুদ্রের চোখ!

অস্ফুট কণ্ঠে কথা বললেন ডঃ বাসু।

—কি বললে? হ্যাঁ তাই। চেহারায় দুটি চোখেরই মত। এরই উদ্দেশ্যে আগামী কাল আমরা যাত্রা করছি। ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন—হঠাৎ কথার ফাঁকে থেমে পড়লেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। তাঁর চোখ দুটি তখন উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করছে।

মনে হল ডঃ বাসুকে তিনি যেন নিরিখ করে নিচ্ছেন।

বলুন। বলুন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। উৎকণ্ঠার সুরে কথা বললেন ডঃ বাসু।

হ্যাঁ। তুমি আমার ছাত্র। একমাত্র তোমাকেই সে কথা আমি বলতে পারি, ডঃ বাসু।—যে করেই হোক, আমাদের এই অভিযান আরও তিনদিন পিছিয়ে দিতে হবে। আমি জানি একমাত্র তোমার পক্ষেই এ কাজটি করা সম্ভব।

তার মানে? ডঃ বাসুর কণ্ঠে এবার রীতিমত বিস্ময়।

মানে এই, যদি সেটা আমরা না করি, সারা পৃথিবীর মানুষ একদিন বড় রকমের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবে। ব্যাস। আর প্রমাণিত হবে, আমরা বিজ্ঞানীরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন অবিজ্ঞানী মানুষের হাতের পুতুল। তাদের মর্জির ওপর নির্ভর করবে আমাদের সম্ভাবনার ভালমন্দ।

আপনি কি বলতে চাইছেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার। বলতে কি, আমার নিজেরও মাথার ঠিক নেই। আপনার কাছে

আসার আগে কতকগুলি বিভ্রান্তিকর চিন্তা নিয়ে আমি পাগলের মত মুহূর্ত কাটিয়েছি—

তাহলে তুমিও ঘুমতে পারনি দেখছি।

ঠিক তাই। যে অঞ্চলের দিকে আগামীকাল আমাদের যাওয়ার কথা, গত কয়েক বছর ওই অঞ্চল নিয়ে কিছু গুজব রটেছিল। গুজবই বলছি। কারণ যা যা আমি শুনেছিলাম, তাদের বিশ্বাস করার মত যুক্তি খুঁজে পাই নি।

কথা ক'টি বলে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচকে ডঃ বাসু ডেভিডের সেই আলোর রোশনাই, সেই জেলের দেখা অদ্ভুত প্রাণী এবং জনৈক জাহাজী ক্যাপ্টেনের বর্ণনার কথা একে একে বলে গেলেন।

তাহলে দেখছি ব্যাপারটার খুব কাছাকাছি তুমি পৌঁছে গেছ। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

আপনি এ সব বিশ্বাস করেন? আপনারও কি ধারণা এ সব ঘটনা সত্যি? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

সমস্তই সত্যি। আলোর রোশনাই হিসাবে ডেভিড যা দেখেছিল, সেটা আসলে সমুদ্রের প্রাণী এবং উদ্ভিদ নিয়ে কয়েকটি জটিল গবেষণার কাজ। বলতে কি, ওই রোশনাই যেখানে দেখা গিয়েছিল সেখানে আমিও উপস্থিত ছিলাম।

বলছেন কি ডক্টর, আপনি—মানে, আপনি নিজে সেখানে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন? ডঃ বাসুর এবার বাক লোপ হওয়ার মত অবস্থা।

নিশ্চয়। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

তাহলে সেই জেলের দেখা অদ্ভুত প্রাণী—তার কি হবে? প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

ওরা প্রাণী নয়। বিশেষ ধরণের ডুবো জাহাজ। ওই সব জাহাজের এক একটিতে ছিল এমন ধরণের গবেষণাগার, পৃথিবীর তাবৎ বিজ্ঞানী যা কল্পনাও করতে পারবেন না।

সেই গবেষণাগারের মধ্যে নিশ্চয় আপনি ছিলেন না ?

অবশ্যই ছিলাম। আমি একা নই। আরও অনেকে ছিলেন।

অনেকে মানে ?

বলছি। বলার জন্যেই এভাবে গভীর রাতে তোমাকে ডেকে আনা।

ক্যাপ্টেনের দেখা সেই ফোয়ারাটাও নিশ্চয় বাজে কথা কিছু নয়।

তাতে আর মিথ্যে কি ? ক্যাপ্টেন ঠিকই দেখেছিলেন। তবে আরও দিন পনের আগে ওই পথ দিয়ে জাহাজ নিয়ে গেলে আরও কিছু দেখতে পেতেন। ছুটি ঘূর্ণি। ঠিক যে ধরণের ঘূর্ণি নিয়ে এখন তোলপাড় চলছে ঠিক তেমনটিই।

ডঃ বাসু এবার যেন পাগল হয়ে যাবেন।

এসব কি বলছেন ডঃ অ্যাণ্টোনি য়ভিচ ? এত সব কাণ্ড। অথচ এতটুকু আভাষও তো তার আগে কখনও দেন নি ?

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের চোখে মুখে কোন উচ্ছাস নেই। যেন পাথরের সমাধি নিয়েই কথা বলে চলেছেন তিনি।

তাহলে আপনি বলছেন, সেই ফোয়ারাটা কোন তিমি মাছ তৈরি করেনি ? প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

পাগল হয়েছ ? ভারত মহাসাগরের এ অঞ্চলে কেউ কোন দিন তিমি দেখেছে বলে কখনও শুনেছ নাকি ?

সেটা তাহলে কি ?

একটি ডুবো পাহাড়ের ভেতর থেকে জল বের করে দেওয়ার কাজ চলছিল।

আর যেন ভাবতে পারেন না ডঃ বাসু। বুড়ো বলে কি ? হঠাৎ কি তাঁর মাথার গোলমাল হয়ে গেল ? না কি নিজেই ভুল শুনছেন তিনি ? গভীর রাতে এমন একটি পরিস্থিতিতে তিনি কি এখন ঠাকুমার ঝুলির গল্প তৈরি করতে চলেছেন ?

ডঃ বাসুর মনের অবস্থা বুঝে নিতে কষ্ট হল না ডঃ অ্যাণ্টো-নিয়েভিচের। তিনি তাঁর কাঁধে মৃদু করাঘাত করে বললেন, মাথাটা

তোমার একটু ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা কর বাছা। অনেক কিছুই তোমাকে বলব আমি। তোমার মত অবস্থায় আমাকে এ কথা বললে আমি তাকে বলতাম—পাগল।

এ কথায় ডঃ বাসু খানিকটা লজ্জিত হলেন যেন।

বললেন, কিছু মনে করবেন না, স্যার। আসলে আপনার কথাবার্তা অমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিছি না। আপনি পাহাড়টা সম্পর্কে কি বলছেন যেন?

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ বললেন, পাহাড়টার মধ্যে বিরাট একটি গহ্বর সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই গহ্বরের মধ্যে থেকে পাম্পের সাহায্যে তখন জল বের করে দেবার কাজ চলছিল। সেই জলই ফোয়ারার মত সমুদ্রের বুকে ফুঁড়ে উঠে যায়। জাহাজের ক্যাপ্টেন যা দেখেছিলেন, সেটা ওই ফোয়ারা।

মানে—? ডঃ বাসু এবার পুরোপুরি নির্বাক।

সত্যিই শক্ত মানুষ ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটিকে ডঃ বাসুর মনে হল যেন অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব। চিরদিনই তিনি মধুরভাষী। কথা বলেন কম। কিন্তু তিনি যে এত সরব হতে পারেন, এই প্রথম যেন তার প্রমাণ পেলেন ডঃ বাসু।

ধীরে ধীরে কথা বললেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ। —একটা ডুবো পাহাড়ের ভেতরে বিরাট একটি গুহা সৃষ্টি করা হয়েছে। ক্যাপ্টেনের কথায় অনুসন্ধানকারী যে দলটি সেখানে গিয়েছিল পাহাড়টিকে দেখেওছে তারা। কিন্তু বুঝতে পারে নি। বোঝার জো ছিল না।

গুহাটি কে তৈরী করলেন? কেন এবং কী ভাবেই বা এত বড় কাজ পৃথিবীর মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে তৈরি করা সম্ভব হল?

সব কিছুই তোমাকে বলব, ডঃ বাসু। ব্যস। আর কোন কথা নেই। আমার ছোট্ট এই ডায়েরিটি চটপট্ পড়ে নাও দেখি। আমি ততক্ষণ কয়েকটি জরুরী অঙ্ক কষে নিই।

বলেই, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ ছোট্ট একটি ডায়েরি এগিয়ে দিলেন ডঃ বাসুর হাতে। তারপর নিজে খাতাকলম নিয়ে বসলেন।

কি দারুণ প্রাণশক্তি এই ভদ্রলোকের, যেন ভাবা যায় না।

রুদ্ধশ্বাসে একে একে ডায়েরির পাতা উল্টে চললেন ডঃ বাসু। সন, তারিখ এবং প্রতিটি ঘটনা। বিভিন্ন চরিত্র। মনে হল, এ সবই তো তাঁর জানা। বিক্ষিপ্তভাবে সব কিছুই তিনি শুনেছিলেন যখন তিনি টেকসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ সব যে নিজের চোখে দেখতে হবে, কখনও কি কল্পনাও করতে পেরেছিলেন ?

হ্যাঁ। এইতো, এই পাতায় সেই আলোর রোশনাই-এর ব্যাপারটা।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ লিখেছেনঃ ১। আলো মাছের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এটা আমরা জানি। এখন দেখতে হবে, ঠিক কোন রঙের আলো ঠিক কোন মাছকে আকর্ষণ করে। লাল, নীল, হলুদ অথবা বেগুনী। অত্যন্ত বিশুদ্ধভাবে এই সব আলো কি করে তৈরি করা যায়, আমরা জেনে ফেলেছি। শুধু নীল আলো হলেই তো হবে না। দরকার বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘের নীল আলো। বিশেষ বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘের আর সব আলোও এখন আমরা তৈরি করতে পারি। দেখছি, আমরা যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। এক এক ধরণের মাছ এক এক তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো পছন্দ করে। সমুদ্রের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে, যেখানে মাছের খাবার ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটোন জন্মায় বেশি, সে সব অঞ্চলে এই আলো নিয়ে পরীক্ষা করা দরকার।

২। অভূত পূর্ব। মাত্র দিন পনের ধরে আমরা পরীক্ষা চালিয়েছি। মাথা বটে সেই লোকটার (?)। মতলব বের করেছিলেন বেশ। মাস দুই আগেই তো হিউসটনে বসে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলাম। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে যে তিনি এত চটপট কাজ সেরে ফেলবেন, ভাবা যায় না।

ডঃ বাসু এ জায়গাটা পড়তে গিয়ে একটু থামলেন। কার কথা বলতে চান ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ ? কে এই লোকটা ? যাঁর এত প্রশংসা তাঁর মুখে ? না। খোলাখুলি নামটা তিনি উল্লেখ করেন নি। কিন্তু—? কে হতে পারেন ? হিউসটন। তাহলে কি—?

ডায়েরির পাতা ওল্টালেন ডঃ বাসু।

৩। একান্ত অনুরোধ। তাই খুব কম সময়ের জন্যেও তাঁর অনুরোধে দু দিনের জন্যে একবার আসতে হল। দেখছি, ভারত মহাসাগরের এ দিকটা কিছুটা বিপজ্জনক। দক্ষিণ দিক থেকে ঠিক নালার মত কিছু কিছু অংশ সমুদ্রের নিচে শক্ত শিলাস্তরের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে এসেছে। মাথার ওপর জল না থাকলে মনে হত ওগুলি এক একটি নদী। ওই সব নদী দিয়ে এগিয়ে আসছে ঠাণ্ডা জলের স্রোত। সম্ভবতঃ দক্ষিণ মেরুর বরফ গলা জল। লবণাক্ত জলে সমুদ্রের গভীরে পরিচলন চলে কমে। তাই হয়ত এই ঠাণ্ডা জল ওপরের স্তরের উষ্ণ জলের সঙ্গে চট্‌ করে মিশতে পারে না। কিন্তু বলতেই হয় এই পরিবেশে কাজ করা শক্ত। কারণ মাঝে মাঝে ওই সব সাগরে নদীর স্রোতের বেগ এত বেশি বেড়ে যায় যে, ডুবো জাহাজকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা দায়। অথচ উপায় নেই। মাছের ঝাঁক এই অঞ্চলেই বেশি। বিশেষ করে চিংড়ি বা ওই জাতীয় প্রাণীর। দেখতে পাচ্ছি, আলোর প্রভাবে ঠিক সম্মোহিত প্রাণীর মত তারা গুঁটি গুঁটি কেমন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিজের চোখেই তো দেখলাম।

৪। দলে কাজ করছে মোট একশ' জন। প্রচণ্ড ঝক্কি নিয়ে। প্রথমতঃ, যে কোন মুহূর্তে এরা সাগরের নিচে কবরস্থ হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এদের কাজ কর্মের খবর কোন ক্রমে যদি মুক্ত পৃথিবীর কাছে প্রকাশ পায়, আমি হলফ করে বলতে পারি, একটা আন্তর্জাতিক ঝড় উঠবেই। রাজনৈতিক ঝড়। কারণ, সবাইতো আমরা জানি, পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানী রাজনীতিকদের কাছে এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের

সমান। ওদের মর্জির ওপর তাদের কোন কোন কাজ অনেক বেশি নির্ভর করে। তাই সব সময় চোখ রাখতে হচ্ছে সজাগ। যা করা হচ্ছে, কেউ যেন এখনই জানতে না পারে।

৫। সর্বনাশ! এ তল্লাটের কাছে কোলে যে মুক্তো সংগ্রহ করতে লোক আসে সে কথা তো জানা ছিল না? দূর থেকে ডুবরীই তো মনে হল? লোকটার সাহস আছে। প্রাণ হাতে করে না হলে এমন ভাবে এমন বিপজ্জনক জায়গায় কেউ ডুব দেয়? উঃ। লোকটা আমাদের কাজকর্ম দেখে ফেলেছে কি না, কে জানে। তবে ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আলো আমরা নিভিয়ে দিয়েছি। বাহাদুর, জন! তোমাব তৈরি আলট্রাসোনিক যন্ত্রটির বাহাতুরী আছে বটে। অতি কম্পনশীল তার শব্দ তরঙ্গ ছুটে গিয়ে ঠিকই সে আবিষ্কার করেছে সমুদ্রে একজন মানুষের আগমন হয়েছিল।

এ জায়গাটায় এসে আর একবার থামলেন ডঃ বাসু।

কার কথা বলছেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ? ডেভিড?

হয়ত বা।

আলোর সাহায্যে সম্মোহিত করে বিশেষ বিশেষ মাছের ঝাঁককে ওভাবে ডেকে আনার পেছনেই বা কি কারণ থাতে পাবে?

৬। বেড়ে ডুবো জাহাজ বটে! পারমাণবিক শক্তিচালিত এমন খুদে খুদে ডুবো জাহাজ না হলে এত সব কাজ কি করা যেত? বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে মনে হবে অজ্ঞাত কোন মাছ যেন সমুদ্রের বুকে সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছে। আর তার ভেতরে চট্‌পট্ নানা রকম গবেষণা করার সাজসরঞ্জামই বা কত! হিউস্টনের সেই বিজ্ঞানী দলটিকে প্রসংসা না করে পারা যায় না।

৭। যাক, মাছ কি করে বশ করতে হয়, জানা গেল। কৃত্রিম উপায়ে এদের চাষ করে খাদ্য সমস্যা মেটান যাবে।

৮। কৃত্রিম উপায়ে সালোকসংশ্লেষণ করে খুব কম সময়ে সমুদ্রেব নিচে যে উদ্ভিদের উৎপাদন দারুন ভাবে বাড়িয়ে দেয়া যেতে পারে,

আজ নিজে চোখে দেখলাম। এতে করে লোকটা (?) বিশুদ্ধ অকসিজেন পাওয়ার সমস্যাটা মিটিয়ে ফেলবে বলে আমি মনে করি। তোফা! মাটির পৃথিবীতে মানুষ এখনও পর্যন্ত যা কল্পনাও করতে পারে নি, সমুদ্রের নিচে সেটাই বাস্তবে ঘটতে চলেছে।

না। সারা ডায়েরিতে কোন কিছুই খোলাখুলি বলা হয় নি। ছোট ছোট মন্তব্য। তার পাশে এক, দুই, করে নম্বর বসান। কারোর নাম নেই। আসলে কি যে সব করা হচ্ছে, তাও বলা হয় নি। ডায়েরির শেষের দিকে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ কয়েকটি মন্তব্য করেছেন। যেমন,

এক। সূর্য থেকে যে আলো আসে, দেখা যাচ্ছে তার থেকে একটি বিশেষ তরঙ্গ দৈর্ঘের আলো আলাদা করে যদি গাছের পাতার ওপর নিক্ষেপ করা যায়, গাছের উৎপাদন বাড়ে। এর সাহায্যে যে ফসল তৈরি হতে স্বাভাবিক অবস্থায় সময় লাগে তিন মাস সেই ফসল দশ দিনেই তৈরি করা যে সম্ভব, তা প্রমাণিত হয়েছে। (বোঝা গেল, এ ডায়েরির লেখক অত্যন্ত সতর্ক। কে প্রমাণ করল সে কথা লেখেন নি।)

দুই। ভাগ্য ভাল। খাবার তৈরির জন্যে আর সূর্যের আলোর দরকার হবে না। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় আলো তৈরী করেই উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষণ চালান সম্ভব হয়েছে।

তিন। অসুবিধে ছিল জঞ্জাল মুক্ত করা। আর এসব নিয়ে মাথা ঘামানর দরকার নেই। জঞ্জালকে আবার প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিক করা যাবে।

চার। মাছগুলি কি অদ্ভুত। যেন পোষমানা কুকুরের বাচ্চা। ওদের যা বলা হয় তাই করে।

এবং সব শেষের অংশে গিয়ে ডঃ বাসু যা পড়লেন, মনে হয় তার চইতে অবিশ্বাস্য ব্যাপার আজকের দিনে আর কিছু ঘটতে পারে কিনা সন্দেহ।

অসম্ভব। মন্তব্য করলেন ডঃ বাসু।

কি অসম্ভব? খাতার ওপর মুখ গুঁজে ছোট্ট একটি উত্তর দিলেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

আপনার এই শেষ অংশটুকুর কথাই বলছি। ডঃ বাসুর উত্তর।

একটু সবুর কর। আমার হয়ে গেছে। এই অঙ্কটি শেষ করে তোমার কথার উত্তর দেব।

মিনিট দুই বিরতি।

তারপর হাতের পেন্সিলটা টেবিলের ওপর রেখে খানিকটা আত্মগত-ভাবে যেন কথা বললেন অধ্যাপক। ডঃ বাসু, যা পড়লে তার এক ইঞ্চিও বাড়ান নয়।

আপনার ডায়েরি পড়ে আমার এতদিনের চিন্তাভাবনা সব গুলিয়ে যাচ্ছে, প্রফেসর। জানি, বৈজ্ঞানিক জগতে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসছে। কিন্তু সেটা যে এত তাড়াতাড়ি আসবে, আমি ভাবতে পারি না। বললেন ডঃ বাসু।

আসাটা কি উচিৎ নয়? তাব দরকারও তো রয়েছ। পৃথিবীতে রব উঠেছে মানুষগুলি আর কয়েক বছর পর এই বুঝি সাবাড় হয়ে গেল। খাবার নেই, বাসস্থান নেই—ও সব সমস্যা নিয়ে স্টকহোমে মিটিং চলছে। লম্বা লম্বা চটকদার বক্তৃতার ঝড় উঠছে এই যা। কিন্তু আমি বলি সমস্যা যতই আসুক, বিজ্ঞনীরা তার সমাধান করবেনই। পৃথিবী থেকে মানুষ কোনদিনই নিশ্চিহ্ন হবে না, ডঃ বাসু। হ্যাঁ, সে সব কথা থাক এখন। আমি যা বলেছিলাম, আমাদের কিছু সময় দরকার। অন্তত তিন দিন। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ চলছে এখন। ঠিক এই সময় সেই ঘুর্ণির জায়গাটায় আমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে না। তাই বলছিলাম সেনা বিভাগের ওই লোকটাকে—কি যেন নাম তাঁর—

কমোডোর ব্যানার্জি।

হ্যাঁ কামোদোরে বানার্জি। ওর কথাই বলছিলাম। যে করে হোক আগামী তিন দিনের জন্যে ওকে রুখতেই হবে। নইলে বড়

রকমের একটা সাফল্য আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এই।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলে গেলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

আর পাথরের মত বসে রইলেন ডঃ বাসু। তাঁর মনে হল এবার তিনি পাগল হয়ে যাবেন। আর মনে মনে ভাবলেন, তাহলে সেই ঘূর্ণির ব্যাপারে আপনিও জড়িত, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ?

জানি না, কমোডোর আমার কথা শুনবেন কি না ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। জানেনই তো সেনা বিভাগের লোকদের ব্যারাম। রুটিন ছাড়া এক পাও নড়বেন কি তিনি? বললেন ডঃ বাসু।

নড়তেই হবে। হি মাস্ট। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কণ্ঠস্বরে এবার দৃঢ়তার ছাপ।

কমোডোরকে কি ভাবে বোঝাতে হবে সে কথাও বললেন তিনি।

দেখি, কতদূর কি করা যায়। বলে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন ডঃ বাসু।

রাত তখন সাড়ে চারটে।

দু চোখে তন্দ্রার জড়িমা নিয়ে পরদিন ডঃ বাসু যখন ঘুম থেকে উঠলেন ঘড়িতে তখন ছ'টা। টেলিফোন অপারেটারকে ঘুম ভাঙ্গানর জন্যে গত রাতেই জানিয়ে রাখা হয়েছিল।

সুপ্রভাত, ডঃ বাসু। ঘড়িতে এখন ছ'টা। মিষ্টি গলায় কথা বলল টেলিফোন অপারেটার।

সুপ্রভাত, মিস। ধন্যবাদ। বলেই কান থেকে রিসিভার নামিয়ে উঠে পড়লেন ডঃ বাসু। এবং প্রথমেই ভাবলেন, সুমিত্রার সঙ্গে একবার কথা বলা উচিৎ। তাই টেলিফোন রিসিভারটি আবার তুলে ধরলেন তিনি।

ইয়েস, স্যার? অপারেটার স্পিকিং। ওপার থেকে অপারেটার কথা বলল।

আমাকে দয়া করে তেইশ নম্বর ঘরটা একবার দিন তো? ডঃ বাসু।

পরক্ষণেই ওপার থেকে রিঙ-এর শব্দ এল।

ডঃ মালহোত্রা স্পিকিং। কথা বলল সুমিত্রা।

সুপ্রভাত। আমি ডঃ বাসু বলছি, সুমিত্রা। ডঃ বাসু।

সুপ্রভাত, ডঃ বাসু। রাতে ভাল ঘুম হয়েছিল তো? সুমিত্রা।

পরে বলব। তার আগে তুমি স্নানটান সেরে তৈরি হয়ে নাও দেখি। আমি সাতটার মধ্যে তোমার ঘরে আসছি। জরুরী কথা আছে। ডঃ বাসু।

জরুরী কথা? আবার কি ঘটল? সুমিত্রার কণ্ঠে বিস্ময়।

সে সব সামনাসামনি বলব এখন। ডঃ বাসু টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার পর স্থির পাথরের মতো কিছুক্ষণ বসে রইলেন তিনি।

একটা অদ্ভুত আত্মসমাহিতের মত অবস্থা মুহূর্তের জন্যে তাঁকে যেন গ্রাস করে ফেলল। মনের মধ্যে ভেসে উঠল ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের মুখ। তাঁর ডায়রির এক একটি পাতার ওপর লেখা অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর এক একটি বিবরণ।

না পুরোপুরি বিবরণ নয়। শুধু কতকগুলি টিকাটিপ্পনি. সেই সব টিকাটিপ্পনি থেকে শুধু এটুকু বোঝা গেল, সমুদ্রের গভীরে প্রাণী বিজ্ঞান নিয়ে কোন একটি দল গবেষণা করছেন! এমন সব গবেষণা যাদের কথা খোলাখুলিভাবে এখনই তাঁরা প্রকাশ করতে চান না।

কিন্তু সমুদ্রের বুকে সেই যে ফোয়ারা তার কি হবে? এ জায়গাটা ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ তাঁর ডায়ারিতে অস্পষ্টই রেখে দিয়েছেন। এমন কি এই সব গবেষণা কারা করছেন, কার পরিচালনায় করা হচ্ছে, সে কথাও এখনও পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করেন নি।

আর সেই ভূমিকম্পটা ?

ডঃ বাসু ঠিক মতই জানেন সমুদ্রের বুকে যে জায়গাটায় ঘূর্ণি দেখা দিয়েছিল, ভূমিকম্পনের মূল কেন্দ্রটি তার কাছাকাছি কোন জায়গাতেই হবে। এখন দেখা যাচ্ছে যে সব ঘটনা ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের ডায়ারিতে লেখা হয়েছে তারাও যেন ওই অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও ঘটেছিল।

না। আর ভাবা যায় না। ভেবে এ সবের যেন শেষ নেই।

ডঃ বাসু স্নান সেরে বেরোনের পোষাক পরে সুমিত্রার ঘরে গেলেন ঠিক সাতটায়।

বেশি কথা নয়। সংক্ষেপে গত রাতের অভিজ্ঞতার কথাগুলি ডঃ বাসু সুমিত্রাকে বললেন। কথাগুলি শুনে সুমিত্রা কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

বিরতি।

তারপর ডঃ বাসু বললেন, এখন কি করবে বল। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। নইলে একটা মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনাকে আমরা হারাব। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকেও। এ হতে পাবে না।

কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, ডঃ বাসু। কি করে তা সম্ভব ? কমোডোর কি আমাদের কথা শুনবেন ? কথা বলল সুমিত্রা।

না শুনলে অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। খানিকটা দৃঢ়তা নিয়ে কথা বললেন ডঃ বাসু।

তার মানে ? সুমিত্রার কণ্ঠে এবার বিস্ময়।

জানি না। সব কিছুই নির্ভর করছে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের ওপর। বললেন ডঃ বাসু।

জানি, আপনি কি বলতে চান, ডঃ বাসু। কিন্তু ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের পক্ষে সেটা কি বড় রকমের একটা ঝক্কি বলে আপনার মনে হয় না ?

ঝক্কি তো বটেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঝক্কি নেয়া ছাড়া উপায় কি

আছে বল ? আর তা ছাড়া ঝক্কি না নিয়ে বড় কোন কাজ কেই বা করতে পারে ? কতকটা স্বগতোক্তির মত কথা বললেন ডঃ বাসু।

ডঃ বাসু হাত ঘড়ি দেখলেন।

সাড়ে সাতটা।

তার মানে আর পনের মিনিট পরই কমোডোর ব্যানার্জি আসবেন। আর তার পনের মিনিট পরই বেনানগার পথে যাত্রা করতে হবে।

এতক্ষণ বড় বেশি যেন আত্মমগ্ন ছিলেন দুজনেই। একমাত্র দৃষ্টি ঘড়ির কাঁটার দিকে।

জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর কখন একফালি রোদ এসে পড়েছে, কারোর খেয়ালই হয় নি। সেখানে চোখ পড়তেই সুমিত্রা বলল, বাবা, অনেক বেলা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

ব্রেকফাস্ট এল এর পর।

ওঁরা নীরবে প্রাতঃবাশ শেষ করলেন কতকটা যান্ত্রিক মানুষের মত।

গেস্ট হাউসের বাইরে ইউক্যালিপটাস এবং দেবদারু গাছের ডগায় তখন রোদের নাচন। পোর্ট ব্লেয়ারের আকাশ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। কাছেই কোন গাছের ওপর থেকে একটানা টি টি করে ডেকে চলেছে কি যেন একটা পাখি। অবশিষ্ট যা, একটা শান্ত সমাধি অবস্থা।

নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী সবাই যখন লবিতে এসে উপস্থিত হলেন ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পঞ্চাশ মিনিট। পরস্পর সুপ্রভাত বিনিময় করলেন তারা। যদিও প্রত্যেকেরই মুখের ওপর ছিল একটা আত্মমগ্নভাব। একটা মারাত্মক কিছু করতে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে কোন মানুষের মুখেই সব সময় যা প্রতিভাত হতে দেখা যায় তেমনটি।

তবে ডঃ বাসুর মনে হল ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ আজ সকালে যেন মনের দিক দিয়ে অনেকটা প্রফুল্ল। অন্তত গত রাতে যতটা বিমর্ষ

দেখাচ্ছিল তাঁকে এখন তিনি সে ভাবটা যেন অনেকটা কাটিয়ে উঠলেন।

সুমিত্রা বলল, আজ আপনাকে বেশ চাঙা মনে হচ্ছে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

বল কি ? তোমার কি সত্যিই তাই মনে হচ্ছে ? খানিকটা হাল্কা সুরে কথা বললেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

তাই তো মনে হয়। সুমিত্রা।

উপস্থিত বিজ্ঞানীরা তখন নিজেদের মধ্যে কথা বলায় ব্যস্ত হলেন। এমন কিছু নয়। এ সব সময়ে সাধারণতঃ হাল্কা কথাবার্তা, আবহাওয়া বিষয়ে কিছু মন্তব্য, অথবা রাতে কার কেমন ঘুম হয়েছিল—মানে নিছক আড্ডা আড্ডা ভাব আর কি।

উপস্থিত বুদ্ধি বটে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের।

সবাই যখন নিজেদের মধ্যে মশগুল এবং মাঝে মাঝে নিজের নিজের হাত ঘড়ি দেখে কমোডোর পথের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করছিলেন, সেই ফাঁকে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ ডঃ বাসু এবং সুমিত্রাকে নিয়ে একান্তে সরে এলেন।

আসল কথা এই, মুখের ওপর হাল্কা আমেজ ছড়িয়ে রাখার চেষ্টা করলেও এতক্ষণ ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা যে খুব উদ্বিগ্ন হয়েই অপেক্ষা করছিলেন, বলাই বাহুল্য।

একান্তে সরে আসার পর ডঃ বাসুই কথা বললেন প্রথম : বলুন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ, রাস্তা কিছু আবিষ্কার করা গেল ?

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে আর সবাইকে দেখে নিয়ে বললেন, এখনও পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পেরেছি কিনা জানিনা। তবে কিছুটা যোগাযোগ করা সম্ভব হয়েছে। ভোর চারটের সময় আমার 'একস্' সংকেতটি কাজ করেছে। উত্তর পেয়েছি। কিন্তু শেষ ঝক্কিটা আমাদেরই সামলাতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

আপনার সংকেত তাহলে পৌঁছেছে সেখানে ? একটা অভাবিত

আনন্দে ডঃ বাসুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ওয়ানডারফুল! সাফল্যের আতিশয্যে যেন চিৎকার করেই কথা বলল সুমিত্রা। অবশ্য পরক্ষণেই সামলে নিল সে। বুঝতে পারল এত জোরে তার কথা বলাটা ঠিক হয় নি।

কিছু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন ডঃ রামচন্দ্রন এবং ডঃ দত্ত। সুমিত্রার কণ্ঠস্বরে, তাঁরাও যেন চমকে উঠলেন।

চমকে ওঠার কারণও ছিল। এ পর্যন্ত এই মহিলা বিজ্ঞানীকে তাঁরা বড় একটা কথা বলতে দেখেন নি। সুমিত্রা যেটুকুও বা কথা বার্তা বলেছে, যথেষ্ট সংযত হয়েই বলেছে। তার মধ্যে উচ্ছাস ছিল না।

কি ব্যাপার? ডঃ মালহোত্রাকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে? প্রশ্ন করলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

বুকের ওপর হাতুরীর ঘা পড়ল তিনজনের। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ ডঃ বাসু এবং সুমিত্রার।

কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ প্রথম।

খানিকটা লঘু সুরে তিনি বললেন, সুমিত্রাকে ডুবো জাহাজের আমার মজার একটা অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলাম।

আর শুনে কি হবে, এবার উনি নিজেই তো অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চলেছেন। খানিকটা রসিকতার সুরে কথা বললেন ডঃ দত্ত।

ঠিক কথা। সায় দিলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

সবাই হেসে উঠলেন এক সঙ্গে, এবং পরক্ষণেই নিজেদের মধ্যে যেমন কথাবার্তা চলছিল সেই রকম চলতে লাগল।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, মাই ডটার, আর একটু হলেই ঝুলিয়ে দিচ্ছিলে তুমি।

আমি দুঃখিত প্রোফেসর। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল সুমিত্রার মুখ।

তাহলে, প্রোফেসর, আপনি বলছেন অসুবিধে কিছু হবে না? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

জানি না। কারণ এর পরের মুহূর্তগুলি সম্পর্কে বলা কারোর পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে যতক্ষণ না কাজ শেষ হচ্ছে, আমরা তিনজন সব সময় কাছাকাছি থাকব। কারণ পুরো ব্যাপারটা সামলে নিতে হবে আমাদেরই। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

আপনি বলছিলেন, আমাদের যাত্রাকে তিন দিন পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করতে। কি ভাবে কাজটা করবেন, ভেবে দেখেছেন কি? মানে—

না, কমোডোর ব্যানার্জিকে এ নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই। বললেও উনি বুঝবেন না। ফৌজি লোকেরা রুটিনের বাইরে চট্ করে কাজ করতে চান না। তা ছাড়া ভদ্রলোককে যেন কিছুটা একগুঁয়ে বলেই আমার মনে হয়েছে। ওর মগজে আমাদের কথাবার্তা ঢুকবে না। বরং আপাতত যা উনি করছেন করুন।

তাহলে তিন দিন পিছিয়ে দেবার ব্যাপারটা কি হবে—? ডঃ বাসুর প্রশ্ন।

সময় মত সে সব ঠিক হয়ে যাবে, ডঃ বাসু। শুধু মনে রেখো, আমাদের তিনজনের মধ্যে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝি না হয়। কথাটা বলে একবার সুমিত্রার দিকে চাইলেন ডঃ বাসু।

এই যে, কমোডোর এসে গেছেন।

কথা বললেন, ডঃ দত্ত।

হ্যাঁ এই না হলে ফৌজি অফিসার। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় আটটা। হাত ঘড়ি দেখলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

সুপ্রভাত, ডঃ রামচন্দ্রন, সুপ্রভাত ডঃ দত্ত, সুপ্রভাত ডঃ বাসু, ডঃ মালহোত্রা, ডঃ এ্যান্টোনিয়েভিচ।

সবার সঙ্গে করমর্দন করতে করতে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কাছে এসে যেন চমকে উঠলেন কমোডোর।

স্প্লেনডিড। আপনাকে আজ দারুণ তরুন দেখাচ্ছে, ডক্টর। অ্যান্টোনিয়েভিচের হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে ধরেই কথা বললেন

কমোডোর ব্যানার্জি। —অদ্ভুত সুন্দর আপানার কোটটা তো। আরে একেই বলে বিজ্ঞানী। আমরা সবাই দেখুন কেমন ফরম্যান। আর আপনি বিচিত্র এই কোটটি পরায় কি সুন্দরই না মানাচ্ছে আপনাকে। যেন লম্বা ছুটিতে আমোদ করতে চলেছেন আপনি।

ব্যাপারটা এতক্ষণ সত্যিই যেন কেউ লক্ষ্য করেননি। বিচিত্র রঙের অদ্ভুত একটি চেক কাটা কোট পরেছেন ডঃ অ্যান্টো-নিয়েভিচ। স্পোর্টস কোট। পিঠের ওপর সমান্তরাল পাইপ্‌ করা কাজ। লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, পাইপ। ঘাড়ের ওপর দিয়ে উঠে কলার পেরিয়ে গলার নিচের খাঁজে চলে গেছে। কি সুন্দরই না মানিয়েছে তাঁকে ?

হঠাৎ এই প্রশস্তিতে কি ঘাবড়ে গেলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ ?

ডঃ দত্ত বললেন, একেই বলে ফৌজি চোখ। এতক্ষণ ডঃ এ্যান্টো-নিয়েভিচের পোশাকটা যেন আমাদের কারোর চোখেই পড়ল না।

উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন কমোডোর। —যা বলেছেন স্যার, আমরা ফৌজি লোকেরা পোশাক পরার কায়দা দেখেই বুঝতে পারি কোন সৈনিক কতটা তৎপর। তাই পোশাকের দিকেই আমাদের নজর আগে।

তাহলে এক্ষেত্রে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্তের কথাটা একটু বলুন, কমোডোর। না না, আমরা মোটেই মন খারাপ করব না। আপনি যদি ওঁর একটু বেশি সুখ্যাত করেন আমাদের বলার কিছু নেই। রসিকতার ঢং-এ কথা বললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

বোঝা যাচ্ছে, প্রোফেসর আমাদের চেয়ে অনেক বেশি যুবক। কমোডোর।

কমোডোরের কথায় আবার এক রাশ হাসির বোমা ফাটল।

ধন্যবাদ, কমোডোর। মাথা দুলিয়ে অ্যান্টোনিয়েভিচ কমোডোরকে ধন্যবাদ জানালেন।

পরক্ষণেই শুরু হল ফৌজি তৎপরতা।

কমোডোর ব্যানার্জি সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, আসুন স্যার আপনারা। সি-প্লেন প্রস্তুত। জাহাজ ঘাটায় আমাদের যেতে মিনিট দশ সময় লাগবে। আমার সঙ্গে দয়া করে আসুন আপানারা।

বলেই গাড়ির দিকে পা বাড়ালেন কমোডোর।

অবশিষ্টরা তাঁকে অনুসরণ করলেন।

গাড়ির মধ্যে বসে ফৌজি ঢং-এ কথা বললেন কমোডোর : শুনুন স্যার। দিল্লি থেকে আজ সাতটায় খবর পেয়েছি। আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে নড়চড় হওয়ার কারণ নেই। অর্থাৎ রুটিন মাফিক আমরা কাজ করে যাব। দিল্লীর সঙ্গে আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেছি।

অন্যান্য যাত্রীরা নিশ্চুপ হয়ে শুনতে লাগলেন কমোডোরের বক্তব্য। সে বক্তব্যের মধ্যে নতুন কিছু ছিল না। ছিল কতকগুলি বর্ণনা। কিভাবে কোন পথে তাঁরা যাত্রা করবেন, কোথায় কোথায় কি ধরণের সাবধানতা নিতে হবে, এই সব।

সেই সঙ্গে সবাইকে মনে করিয়ে দিলেন, দেখুন স্যার, আপনারা বিজ্ঞানী। আপনাদের সহযোগিতার ওপরই নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু একটিই। সমুদ্রের একটি অঞ্চলে অনুসন্ধান চালান। প্রতিরক্ষা মূলক নিরাপত্তার ওপর চোখ রাখা শুধু। একটা সন্দেহ আমাদের মনে জেগেছে। তার নিরশনের জন্যেই আমরা এগিয়ে চলেছি।

পরদিন সকাল আটটায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি সি প্লেনে পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে কমোডোর ব্যানার্জি আন্দামানের পোর্টব্লেয়ার থেকে যাত্রা করলেন বেনানগার উদ্দেশ্যে।

সেখানে গিয়ে দেখা ক্যাপ্টেন হিহং এর সঙ্গে। কিতো থেকে তাঁর বড় কর্তারাও এসে হাজির। তাঁদের ভরসায় খানিকটা যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন তিনি। পোর্ট অফিসার মিঃ মেনন, ডঃ বাসু,

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ এবং অন্যান্যের আগমনবার্তা আগেই তাঁকে বলে রেখেছিলেন।

দেখা হতেই ডঃ বাসু বললেন, আপনার কথা আমরা জেনেছি, ক্যাপ্টেন হিহং। —মানে—

—শোনা কথায় আর কতটুকু বুঝতে পেরেছেন, স্যার।—সেই লোকগুলির যদি আর্তনাদ শুনতেন আপনারা। ভাবুন, চোখের সামনে ওরা টুপ করে ডুবে গেল অথচ এই আমি, পনের বছর জাহাজের ক্যাপ্টেনগিরি করছি বলে যে গর্ব করি, কিছুই করতে পারলাম না। কথা বললেন ক্যাপ্টেন হিহং।

মেনন ডঃ বাসুকে বললেন, ভদ্রলোক ভীষণ শক পেয়েছেন। চলুন, ওঁর সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভাল।

দুপুর এগারোটা। বেনানগাতেই সবাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন।

খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম।

কমোডোর ব্যানার্জি বললেন, এখন ঘড়িতে একটা বেজে পঞ্চাশ। আমাদের মনে হয় বিকেল তিনটের মধ্যে আমার যাত্রা করতে পারব, কি বলেন, মিঃ মেনন?

মিঃ মেনন বললেন, তাই তো মনে হয় আমরা। আপনারা এখানে আসার অল্পক্ষণ আগেই আপনাদের সন্ধানী জাহাজের ক্যাপ্টেন মির্জা জানিয়েছেন তিন নম্বর দ্বীপের কাছে একটু যুৎসই জায়গা দেখে হাজির হতে বেশি সময় তিনি নেবেন না।

তিন নম্বর দ্বীপ? সেটা আবার কোথায়? কতকটা সগোক্তির মত প্রশ্ন করলেন ডঃ বাসু।

যেখানে ঘূর্ণি উঠেছিল সেখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। বললেন কমোডোর।

দ্বীপ না বলে একটি ডুবো পাহাড়ও বলা চলে। আসলে যখন ডুবে থাকে তখন আমরা বলি পাহাড়। আর যখন জলের ওপর ভেসে ওঠে তখন বলি দ্বীপ। তিন নম্বর দ্বীপ। কারণ ওই ধরণের আরও দুটো বস্তু ওর কাছাকাছিই আছে। কতকটা ত্রিভুজের মত দেখতে এই তিনটি দ্বীপ সমুদ্রের তলা থেকে মাথা উঁচু করে উঠে এলেও জোয়ারের সময় ওদের মাথা জলের নীচে তলিয়ে যায়। একমাত্র ভাটার সময় ঘণ্টা তিন চার মাথাগুলি জলের ওপর ভেসে ওঠে। ব্যাপারটা বিশদ করলেন মিঃ মেনন।

মিঃ মেননের কথা হাঁ হয়ে শুনছিল সুমিত্রা। ব্যাপারটা তার কাছে খানিকটা কৌতুকের মতই মনে হল।

মিঃ মেননের কথা শেষ হতেই সুমিত্রা প্রশ্ন করল, তাহলে মিঃ মেনন, এখন যখন বলছেন তিন নম্বর দ্বীপ, তার মানে, বলুন পাহাড়টার মাথা এখন জলের ওপর ভাসছে ?

পুরোপুরি ভাসছে বললে ভুল হবে। কিছুক্ষণ আগে ভাটা শুরু হয়েছে। এতক্ষণে পাহাড়ের ডগা মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে। মেনন।

তার মানে ক্যাপ্টেন মির্জা এবার নোঙর করছেন বলুন। কমোডোর।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, দোহাই মশায় আপনাদের। সমুদ্রের বুকে কাজ চালাতে গেলে কত ফন্দি ফিকিরই না করতে হয়।

এতে আর কতটুকু ফন্দি ফিকির দেখতে পেলেন স্যার। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষা দপ্তরকে আরও কত কিই না করতে হয়। দাঁড়ান না, যে কাজে আমরা এগিয়ে চলেছি, আমার তো মনে হয় না, সেটা এমন জলবৎ তরলং হবে। গুড জিসাস! আদপে এখনও আমি জানি না, আর ঘণ্টা তিনেক পর আমাদের ভাগ্যে কি রয়েছে। আসল কথা, সন্ধানী জাহাজ পর্যন্ত, আমরা ঠিকই যাব। তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা বললেন কমোডোর।

গম্ভীর মুখে কথাগুলি শুনছিলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। আসলে পোর্টব্লেয়ার থেকেই তিনি যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছেন। অত্যন্ত আত্মমগ্ন।

কমোডোরের কথাগুলি মন দিয়ে শুনছিলেন তিনি। তাঁর শেষের মন্তব্যটি শুনে তিনি খানিকটা চঞ্চল হলেন।

কি বলতে চান কমোডোর? সেনা বিভাগের এই সব অফিসারদের চাল চলন কথাবার্তা দেখে কি যে ওঁদের মগজে আছে অনুমান করা শক্ত। এদের জাতই আলাদা। সকালের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত জানতে পারেন নি তো? মনে মনে ভাবলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

ওদিকে সুমিত্রা এবং ডঃ বাসুর চোখে মুখে মৃদু হাসির আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে কমাডোরের শেষ মন্তব্যটি শোনার পর।

সুমিত্রা এবং ডঃ বাসু ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন।

কিন্তু ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের শাসনদৃষ্টি তাঁদের ওপর পড়তেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তাঁরা।

গুরু ভোজনের পর একটা তন্দ্রার আবেশ জড়িয়ে ধরেছিল ডঃ দত্তের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র। নরম কুসনের ওপর নিজের দেহটি ডুবিয়ে দিয়ে তিনি ঘুমের সাগরে তখন নিমজ্জিত।

কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন অ্যানণ্টোনিয়েভিচ।

হঠাৎ ডঃ দত্তের নাসিকাধ্বনি!

বাধা পড়ল।

মৃদু হেসে কমোডোর বললেন, গুড গড! একেবারে আস্ত ঘুম।

হাই তুললেন ডঃ রামচন্দ্রন।

কমোডোর তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন। তারপর মিঃ মেননের দিকে চেয়ে বললেন, মাটি করবেন, মশাই। এমন গুরু ভোজন করালেন

আপনি, এবার ফ্যাসাদ দেখুন। বলেই হেসে উঠলেন তিনি।

ঠিক আছে। হাত ঘড়ির দিকে একবার চেয়ে কমোডোর উঠে পড়লেন—আমাদের হাতে এখনও এক ঘণ্টা সময় আছে। আপনারা বরং বিশ্রাম করুন। আমি মিঃ মেননের সঙ্গে একটু কম্যুনিকেশন টাওয়ারের দিকে যাই। ক্যাপ্টেন মির্জার সঙ্গে একটু যোগাযোগ করতে পারি কি না দেখি। বলেই মিঃ মেননের সঙ্গে বিশ্রাম কক্ষ থেকে চলে গেলেন।

কমোডোর ঘর ছেড়ে যাওয়ার পর মুখ খুললেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

এসো ডঃ বাসু। সুমিত্রা তুমিও এসো। তুপুরের খাওয়ার পর বেশিক্ষণ ঠাঁই বসে থাকলে আমার শরীর খারাপ করে। এসো, বরং একটু চারপাশটা ঘুরে আসি। জায়গাটা সত্যিই মনোরম।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের কথা কানে যেতেই ডঃ রামচন্দ্রনের আধ বোজা চোখ একটু ফাঁক হল। তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে তিনি বললেন, ছাটস এ গুড আইডিয়া। বলেই এবার পুরোপুরি চোখের পাতা তুটি বন্ধ করলেন তিনি।

সুমিত্রা এবং ডঃ বাসুর ঠোঁটের কোনে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

বিশ্রাম কক্ষ থেকে তিনজন বাইরে বেরিয়ে এলেন। ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু, এবং সুমিত্রা।

ওঁরা এলেন বিরাট একটি লনের মধ্যে।

চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ। পায়ের নীচে সবুজ ঘাসের গালিচা। মাঝে মাঝে ফুলের গাছ। লনটি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। ও দিকটায় অসংখ্য নারকেল গাছের সারি এক স্বর্গীয় সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে। আর তার পরেই দিগন্ত বিস্তৃত ভারত মহাসাগর।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ বললেন, এসো, আমরা ওই নারকেল গাছগুলির দিকে যাই। ওদিটা অনেক শান্ত।

একবার চারদিকটা দেখে নিলেন তিনি।

না। কোন লোকজনের সাড়া শব্দ নেই।

ওঁরা এগিয়ে গেলেন। নারকেল গাছের সারি পেরিয়ে বাহারে গাছের একটি ঝোপের সামনে এক গুচ্ছ ঘাসের গালিচার ওপর গিয়ে বসলেন।

ডুবিয়ে দিয়েছিলে তোমরা। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে কথা বললেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। —কমোডোর কথা শুনে ওভাবে হেসে ওঠা তোমাদের উচিত হয়নি। ছেলে মানুষ কাকে বলে! এখন থেকেই যদি তোমরা এত উতলা হয়ে ওঠ, এরপর কি করবে জানি না।

সত্যিই আমাদের অন্যায় হয়ে গেছে, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ। সুমিত্রা, এবং ডঃ বাসু।

না, না, সে কথা নয়, আমাদের আরও সাবধান হয়ে চলতে হবে। কমোডোর ফৌজি মানুষ। এসব লোক আমাদের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক। জানি না শেষের দিকে যে সব কথা বার্তা উনি বললেন, আমাদের গোপন ব্যাপার আবার ফাঁস হয়ে গেল কিনা? যাক, এদিকটা বেশ নিরিবিলি। আপাতত কাজটা সেরে নেয়া যাক।

জায়গাটার মধ্যে অদ্ভুত মাদকতা ছিল। সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়েছে। তার তির্যক আলোয় নারকেল গাছের ছায়াগুলি ঘাসের গালিচার ওপর দীর্ঘতর হতে শুরু করেছে। সেই ছায়ার মধ্যে উড়ে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন বর্ণের প্রজাপতি। নারকেল গাছের সারির গোড়া বেয়ে জমির ঢাল হঠাৎ একটা বাঁক নিয়ে সোজা নেমে গেছে সমুদ্রের দিকে। চারপাশের নীরবতা বিচ্ছিন্ন করছিল সমুদ্রের পাড়ে পর্যায়ক্রমে আছড়ে পড়া ঢেউ।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ একবার চারিদিকটা দেখে নিলেন।

না। কোন দিকে জনমানুষের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

তাহলে এসো ডঃ বাসু, সুমিত্রা। আমাদের আগামী তিন চার দিনে গোপন কাজ কর্মগুলি একবার বুঝে নিই। খুব নীচু গলায় কথা বললেন অধ্যাপক।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ পকেট থেকে এবার একটি কাগজ বের করলেন।

একটি মানচিত্র। তার মাঝখানে সেই দুটি ঘূর্ণির ছবি। ঘূর্ণির সঙ্গে সরু দাগ টেনে যোগ করা হয়েছে ছোট ছোট কয়েকটি ফুটকি।

অধ্যাপক বললেন, এগুলি ডুবো পাহাড়। খুব সাবধান হতে হবে এদের সম্পর্কে। কারণ ঠিক কতটা সমুদ্রের নিচে এরা বিস্তৃত আমাদের জানা নেই। ঠিক মত পাশ কাটিয়ে না যেতে পারলে সমুদ্রের নিচে আমাদের কবরস্থ হতে হবে। অতএব, হ্যাঁ ডঃ বাসু; তেমন বিপদের সম্ভাবনা যখন আসবে সে সময় খুব মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে তোমাকে। আমি অনুমান করতে পারি ওই সময় আর যাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকবেন তাঁদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হবে। আর সুমিত্রা তুমি সব সময় নজর রাখবে আশপাশের ঘটনার ওপর। বরং এ ব্যাপারে তোমার ভূমিকা হবে ডঃ বাসু এবং আমার মধ্যে সংযোগকারী বিজ্ঞানীর।

মানচিত্রের নির্দিষ্ট একটি ফুটকির ওপর হাত রেখে খানিকটা গম্ভীর হলেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

হ্যাঁ, এই সেই তিন নম্বর দ্বীপ। কমোডোর আমাদের নিয়ে এখানে হাজির হওয়ার পর থেকেই আমরা আমাদের তিনজনকে প্রতিমূহূর্ত সাবধান হয়ে থাকতে হবে। কারণ তারপর কি যে ঘটতে পারে আমার নিজেরও জানা নেই। তবে এটুকু বলতে পারি যে কাজটার জন্যে দীর্ঘ অপেক্ষা করতে হচ্ছিল তার সুযোগ করে দিলেন কমোডোর নিজেই।

বলেই অধ্যাপক তাঁর বিচিত্র কোটটির কলারটি দু হাত দিয়ে ঘাড় অবধি তুলে দিলেন।

মৃদু হাসলেন ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ এবার কোটের ভেতরের পকেট থেকে বের করলেন দু-ইঞ্চি ব্যাসের একটি কালো চাকতিটি। চাকতিটি প্রায়

তিন মিলিমিটারের মত পুরু। চাকতির ওপর অধ্যাপকের নাম ঠিকানা লেখা। সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয় অধ্যাপকের নামাঙ্কিত যেন একটি প্রতীক।

তবে একটু নজর করলেই চোখে পড়ে, ওই নাম ঠিকানার মাঝ-খানে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র। প্রতীকটির একপাশ থেকে সূক্ষ্ম সুতোর মত দুটি অংশ কোটের ভেতর পর্যন্ত ঢোকান। সুতো দুটি এত সূক্ষ্ম, খালি চোখে হঠাৎ চোখে পড়ে না। পড়লেও মনে হয়, যেন দুটি বড় চুল হঠাৎ অধ্যাপকের কোটের গায়ে যেন আটকে গেছে।

চাকতিটি হাতে নিয়ে চারদিকটা আর একবার দেখে নিলেন অধ্যাপক। না। কেউ কোথাও নেই।

এবার সেটিকে তিনি মুখের সামনে ধরলেন। মনে হল সূক্ষ্ম চাপ দিলেন তিনি চাকতিটির এক পাশটায় তর্জনির ডগা দিয়ে। তারপর বির বির করে সাংকেতিক ভাষায় কি যেন বলতে লাগলেন।

সুমিত্রা রীতিমত বিস্মিত। কারণ এত সব কথা সে জানত না।

ডঃ বাসু গম্ভীর হয়ে অধ্যাপকের দিকে চেয়ে। এসব ব্যাপার তাঁর জানা ছিল।

পাকা এক মিনিট কথা বললেন তিনি।

তারপর চাকতিটি হাতের তেলোর ওপর ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অতিক্রান্ত হল আরও এক মিনিট।

রুদ্ধশ্বাস তিন জন। তাঁদের দৃষ্টি এবার চাকতিটির ওপর।

এক মিমিট পর চাকতিটির এক পাশে ছোট্ট একটি লাল আলোক বিন্দু দেখা দিল। পরক্ষণেই সেই আলোর পাশে একের পর এক জ্বলে উঠতে লাগল পর্যায়ক্রমে হলুদ, সবুজ এবং বেগুনী আলোর সংকেত। প্রায় আধমিনিট ধরে এসব চলতে লাগল। আর অবশেষে জ্বলে উঠল আর সেই লাল আলো।

এবার অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল মৃদু

হাসির রেখা। তিনি চাকতিটি আবার মুখের সামনে ধরে কি যেন বললেন। পাঁচ সেকেণ্ডের বেশি নয়, তারপর চাকতিটি তিনি বুক পকেটের মধ্যে ভরে নিলেন।

স্নমিত্রা বিস্ময়ে যেন ফেটে পড়ল।

রেডিও ট্রান্সমিটার? অস্ফুট কণ্ঠে কথা বলল স্নমিত্রা।

কোটের কলার যথাযথ করতে করতে কৌতুক দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলেন অধ্যাপক। মৃদু হেসে বললেন, শুধু ট্র্যান্সমিটার নয়। খুদে রেডিও স্টেশন বলতে পার। ট্রানজিসটারের কৃপায় মানুষ কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে এটাই তার প্রমাণ। গায়ের কোটের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে বললেন, পিকেরিং ছোকরার মগজ আছে বলতে হবে। বাইরে থেকে কারোর বোঝার জো আছে কোট নামক যে বস্তুটি আমি পরে আছি এটি একটি আস্ত রেডিও স্টেশন। যার সাহায্যে এই মুহূর্তে আমি যাঁর সঙ্গে কথা বললাম তিনি এখান থেকে কম করেও দেড়শ' মাইল দূরে? ব্যাচারা কমোডোর! সকালের দিকে আমার গায়ের ওপরকার এই চিত্র-বিচিত্র কোটটি দেখে কি স্নখ্যাতিই না করল। কিন্তু সে পলকের জন্যেও বুঝতে পারেনি, এর প্রতিটি পাইপিং-এর মধ্যে আছে ফেরাইটের তৈরী শক্তিশালী এরিয়াল। কলারের ভাঁজের মধ্যে রঙ-বেরঙী স্নতোর কাজ, যা বাইরে থেকে দেখলে যে কোন শিল্পীরই চোখ টাটায়, সেটাও একটি বেতার সংকেত আদান-প্রদান করার এরিয়াল। আর কোটের ভেতর লাইনিং-এর মধ্যে রয়েছে অত্যন্ত স্নক্ষ্ম ইলেকট্রনিকস-এর প্যানেল এবং ব্যাটারি। চাকতিটা তো দেখলেই। এর সাহায্যে সংকেত পাঠালাম। তার উত্তরও পেলাম আমার নামাঙ্কিত অক্ষর গুলির ওপর একের পর এক জ্বলে ওঠা আলোর সংকেত।

ডঃ বাস্ন এসব খবর গত কালই শুনেছিলেন অধ্যাপকের মুখে। তাই তিনি চুপ করে রইলেন।

সুমিত্রা রীতিমত থ। নির্বাক।

যাক। কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে কথা বললেন অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ। —আপাতত সব শুভ। যেটুকু আশঙ্কা ছিল, এখন তা দূর হয়েছে।

সুমিত্রার একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে কার সঙ্গে কথা বললেন তিনি। কিন্তু অধ্যাপক যখন সে ব্যাপারে নীরব রইলেন, তার সাহস হল না। তার একবার মনে হল, ডঃ বাসু এসব ব্যাপার জানে। কিন্তু কই তিনি তো কিছু বলেন নি?

ঘড়ির দিকে চাইলেন অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

আঃ! আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। চল এবার আমরা ফিরে যাই। বলেই উঠে পড়লেন তিনি। তাঁকে নীরবে অনুসরণ করলেন ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা।

ওঁরা তিনজনে যখন বিশ্রাম কক্ষে ফিরে এলেন, ঘড়িতে তখন আড়াইটে বেজে গেছে। ইতিমধ্যে কমোডোর সেখানে এসেগেছেন। ডঃ রামচন্দ্রন এবং ডঃ দত্তের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথা বলছিলেন তিনি। ওঁদের ফিরে আসতে দেখেই কমোডোর জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় ছিলেন আপনারা এতক্ষণ?

এই চারপাশটার শোভা উপভোগ করছিলাম একটু। উঃ, কী বলব আপনাকে কমোডোর, মার্ভেলাস। এত জটলা পাকান নারকেল গাছ আমি জীবনে দেখিনি। দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর আমার ঘুম পায়। আবার ঘুমোলেই শরীর খারাপ করে। তাই সুমিত্রা আর ডঃ বাসুকে নিয়ে একটু সমুদ্রের ওদিকটা ঘুরে এলাম। মৃদু হাসির আমেজ মিশিয়ে জবাব দিলেন অধ্যাপক।

ওঃ। আপনার মনে বেশ রোমাঞ্চ আছে, প্রফেসর। বলেই হেসে উঠলেন কমোডোর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কাকে না রোমাঞ্চিত করে, কমোডোর? অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

এবার সবাই হেসে উঠলেন আর এক প্রস্থ।

আপনাদের আর দেরি করতে হবে না স্যারস। পোর্ট অফিসার মিঃ মেনন এক্ষুনি এসে পড়বেন। মনে হচ্ছে মিনিট দশেকের মধ্যেই আমরা যাত্রা করতে পারব। কমোডোর।

অপেক্ষা করতে হল না।

মেনন এলেন মিনিট খানিকের মধ্যেই।

খবর ভাল? প্রশ্ন করলেন কমোডোর।

এভরি থিং ওলরাইট। পোর্টে আপনাদের জন্যে সি প্লেন অপেক্ষা করছে। আবহাওয়া খুব ভাল। এইমাত্র তিন নম্বর দ্বীপ থেকে খবর পেলাম, প্রতিরক্ষা দপ্তরের জাহাজ যুৎসই জায়গায় নোঙর করেছে। সাবমেরিনও প্রস্তুত। একেবারে জ্যামিতিক ঢং-এ কথা বললেন মিঃ মেনন।

ধন্যবাদ, মিঃ মেনন। আমাদের জন্যে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন আপনি। মিলিটারি কায়দায় ধন্যবাদ জানালেন কমোডোর। তারপর সঙ্গীদের উদ্দেশে বললেন, সো জেণ্টলম্যান, আসুন, এবার আসল কাজে আমরা নেমে পড়ি।

হ্যাঁ ব্যক্তিত্ব আছে কমোডোর ব্যানার্জির। তাঁর চোখ মুখ দেখে বোঝা গেল, এ মানুষ বাইরে থেকে যতটা কোমল, ভেতরে তেমনি কঠোর। নিয়ম শৃঙ্খলার এতটুকু ব্যতিক্রম দানা বেঁধে ওঠার এতটুকু সুযোগ তিনি দিতে চান না।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, আমরা প্রস্তুত কমোডোর।

কমোডোর ওদের নিয়ে লাউঞ্জের বাইরে পা বাড়ালেন।

বাইরে দুখানি মিলিটারি গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তার একটিতে উঠলেন মেনন, কমোডোর এবং ডঃ দত্ত। অপরটিতে উঠলেন অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা।

মেননের অফিস থেকে পোর্ট মাত্র মিনিট পাঁচেকের পথ।

দুখানি গাড়ির মধ্যে নির্বাক কয়েকজন যাত্রী।

পোর্টের এক নম্বর জেটির সামনে এসে গাড়ি দুটি থামল।

প্রথমে নামলন মেনন। পরে একে একে আর সবাই।

অপূর্ব! বলল সুমিত্রা। বিস্তৃত সমুদ্রের ওপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা জাহাজ, তাদের মাথায় উড়ে বেড়ান সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক দেখে মুহূর্তের জন্যে তাঁর মন যেন এক স্বপ্ন রাজ্যে চলে গিয়েছিল।

কমোডোর তারদিকে চেয়ে চেয়ে মৃদু হাসলেন।

মেনন বললেন, কমোডোর ওই সেই জাহাজ। শার্ক।

শার্ক!

কথাটা কানে যেতেই যেন বিদ্যুতের চমক খেলে গেল সবার মনে। মনে হল সবাই যেন যান্ত্রিক মানুষে পরিণত হয়ে গেলে চকিতে। পাথরের মানুষ। মেননের কণ্ঠস্বর সেই মানুষগুলিকে নিথর করে দিয়েছে। সবার দৃষ্টি তখন শার্কের ওপর স্থির।

পুত্তর শার্ক। প্রথম চমকের রেশ কাটতে কথা বললেন কমোডোর। তাঁর কণ্ঠস্বরে অবশিষ্টদের সম্বিৎ ফিরে এল।

আসুন। জেটির একেবারে গা ঘেঁসে আপনাদের সি-প্লেন অপেক্ষা করছে। মেনন।

কমোডোর এবং তাঁর সঙ্গীরা মেননকে অনুসরণ করলেন।

তিন মিনিট বিরতি।

ওঁরা সি-প্লেনে গিয়ে উঠলেন।

হ্যাভ এ গুড ট্রিপ। হাত তুলে শুভ যাত্রা জানালেন মেনন।

ধন্যবাদ। বললেন কমোডোর।

পরক্ষণেই প্লেনের দুটি রোলস রয়েস টার্বো জেট ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। নিজ নিজ আসনে বসে সবাই অনুভব করলেন ঢেউ-এর ওপর তাদের প্লেন দুলছে। তারপর ধীরে ধীরে সামনে এগুলো। জানালার মধ্যে দিয়ে দেখা গেল জলের ওপর ভর দিয়ে ছুটে চলেছে। আর কয়েক সেকেণ্ড পর একেবারে আকাশে।

যাত্রীরা নীরব।

কমোডোরকে মনে হল সম্পূর্ণ সমাহিত।

যুদ্ধের সময় বড় রকমের অপারেশন চালাতে যাওয়ার সময় সৈনিকরা যে ভাবে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বসে থাকে, সাময়িক আত্মবিস্মৃত হয়ে, প্লেনের এক একটি আসনে ঠিক সেই ভাবেই সবাই বসে রইলেন।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

প্লেন এবার নিচের দিকে নামতে শুরু করেছে। নামছে। আরও নামছে।

এবার আমরা সমুদ্রের এক হাজার ফুট ওপর দিয়ে চলেছি। ককপিট থেকে পাইলটের কণ্ঠস্বর ভেসে এল মাইক্রোফোনের মাধ্যমে।

তারপর শোনা গেল কমোডোরের কণ্ঠস্বর। এর মধ্যে কখন তিনি ককপিটে গিয়ে বসেছেন কেউ খেয়ালই করেন নি। কারণ এতক্ষণ জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দৃশ্যের দিকেই চেয়েছিলেন সবাই।

আমি কমোডোর ব্যানর্জি বলছি। জেণ্টলম্যান, আর মিনিট পাঁচের মধ্যেই আমরা তিন নম্বর দ্বীপের কাছে গিয়ে নামব। আপনারা লক্ষ্য করুন, আপনাদের বাঁ দিকে এখান থেকে মাইল চার দূরে সেই জায়গাটা। যেখানে সর্বনাশা সেই ঘূর্ণি দুটি রাক্ষুসে চোখের মত সমুদ্রের বুকে ফুটে উঠেছিল। মাইক্রেফোনে ভেসে এল কমোডোরের কণ্ঠস্বর।

তাঁর কণ্ঠস্বরে সবাই এবার সচকিত হয়ে উঠলেন। তাঁরা প্রসারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সমুদ্রের দিকে। মুহূর্তে অদ্ভূত এক উত্তেজনা যেন গ্রাস করল তাঁদের।

রোমাঞ্চ! রোমাঞ্চ সবার স্নায়ুর মধ্যে।

নিচে সমুদ্র। তাঁর প্রত্যেকটি ঢেউ এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বহু-দূর ভেসে চলেছে একটি জাহাজ। কেমন নিশ্চিন্তে ভেসে চলেছে। ওই

জাহাজের যাত্রীরা হয়ত জানেনা, যে পথ দিয়ে তারা চলেছে মাত্র কয়েকদিন আগেই সেখানে ফুটে উঠেছিল মরণ ফাঁদ।

না। এতটুকু চিহ্ন তার অবশিষ্ট নেই। এ সমুদ্রকে এখন দেখলে কে বলবে সে ভয়ঙ্কর? কখনও সে যে ভয়ঙ্কর হতে পারে এ কথাটা যেন ভাবা যায় না।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্লেন নামল। ক্যাপ্টেন মির্জার জাহাজের পাশে। ক্যাপ্টেন মির্জা ওঁদের সাদর আমন্ত্রণ জানালেন।

জাহাজ থেকে নামিয়ে দেয়া হল লাইফ বোট। সেই বোটে চড়ে সবাই গিয়ে উঠলেন জাহাজে।

বছর চল্লিশ বয়েস হবে ক্যাপ্টেন মির্জার। নিজের কর্মকুশলতায় এই বয়েসের মধ্যেই প্রতিরক্ষা বিভাগের এই জাহাজটির তিনি ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হয়েছেন।

মোস্ট ওয়েলকাম কমোডোর। মোস্ট ওয়েলকাম জেণ্টলমেন অ্যাণ্ড লেডি। এগিয়ে এসে প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করলেন ক্যাপ্টেন মির্জা।

কমোডোর ব্যানার্জি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আসুন, আপনারা আমার অতিথি। যৎসামান্য চা পর্বের সঙ্গে কাজের কথা হবে এখন। ক্যাপ্টেন মির্জা সবাইকে নিয়ে এলেন তাঁর ক্যাবিনে।

বেয়ারা চা এবং কিছু স্ন্যাকস দিয়ে গেল।

কমোডোর কিন্তু এই ফাঁকেই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন। বললেন, এখন বিকেল চারটে। আমরা ভাবছি জলের নিচের অভিযান কাল সকালের দিকেই শুরু করা যাবে। এর মধ্যে রোদের আলো থাকতে থাকতেই চলুন ক্যাপ্টেন মির্জা, পুরো জায়গাটা আমরা একবার পর্যবেক্ষণ করে আসি। হ্যাঁ ভাল কথা, ক্যাপ্টেন সিং-কে দেখছি না তো?

ক্যাপ্টেন সিং আধঘণ্টার মধ্যেই আসছেন কমোডোর। আপনার নির্দেশ মত তিনি ডুবো জাহাজের যন্ত্রপাতি এখন শেষ বারের মত পরীক্ষা করে নিচ্ছেন। সেই সঙ্গে চলেছে আর সব অফিসারদের তালিম দেবার কাজ।

ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং ডুবো জাহাজের ক্যাপ্টেন। বলা যেতে পারে বেপরোয়া ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন মির্জার কথা শুনে একটু যেন চমকে উঠলেন কমোডোর।

কী ব্যাপার? কোন গোলমাল হল নাকি? প্রশ্ন করলেন কমোডোর।

না তেমন কিছু নয়। ঘণ্টাখানিক আগে নেভিগেশনের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি কম্পাস যন্ত্রটিতে কি নাকি একটা ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন। সেটি নাকি ঠিকমত কাজ করছে না।

কম্পাস কাজ করছে না? সে আবার কি? কমোডোর এবার যেন খানিকটা বিস্মিত হলেন।

চকিতে অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রাদের মধ্যে পরস্পর চোখাচোখি হ'ল।

ডঃ দত্ত, আপনার কি মনে হয়? ডঃ দত্তের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন কমোডোর।

কি আবার হবে? এ নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হওয়ারই বা কি আছে? হয়ত কোন যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটেছিল, তাই এমনটি ঘটে থাকবে।

ডঃ দত্ত যে কমোডোরের প্রশ্নকে খুব গুরুত্ব নিয়ে ভাবেননি সে তাঁর কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল।

ক্যাপ্টেন মির্জা ব্যাপারটা হাল্কা করার জন্যে বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই, কমোডোর ব্যানর্জি। ক্যাপ্টেন সিং জানিয়েছেন গোলমাল ঠিক হয়ে গেছে। আপনারা এখন নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

সেটা হলেই ভাল। হ্যাঁ, চা পর্বটা চটপট সেরে নিয়ে চলুন প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের কাজটা মিটিয়ে নেয়া যাক। ভাল কথা,

আপনার স্পিড বোট আছে তো? সমুদ্রের আবহাওয়া শান্ত। জলে বড় বড় ঢেউ-ও চোখে পড়ছে না। আমার মনে হয় স্পিড বোট থাকলে কাজটা চালান সুবিধে হবে। এক নাগাড়ে কথা বলে গেলেন কমোডোর।

ক্যাপ্টেন মির্জা বললেন, বেশ, তাই হবে এখন। ছোটখাটো স্পিড বোট একটা আছে আমাদের। ওতেই কাজ চলে যাবে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি বোটটিকে প্রস্তুত করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।

ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। কমোডোর।

এই না হলে সেপাই বলে? মনে মনে ভাবলেন ডঃ বাসু। ওদের কাজ কর্মের ধারাই আলাদা। নিয়ম শৃঙ্খলা এবং কাজের গুরুত্ববোধ এর চেয়ে বেশি আর কেউ বোঝে কিনা সন্দেহ। সত্যিই পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নিলেন না ক্যাপ্টেন মির্জা।

সব কিছু প্রস্তুত স্যার। এই যে ক্যাপটেন সিং-ও এসে গেছেন। মির্জা মহীন্দর সিং-এর সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

কমোডোর ক্যাপটেন সিং-এর সঙ্গে করমর্দন করতে করতে বললেন, আপনার সঙ্গে বোধ হয় বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় আমার একবার পরিচয় হয়েছিল ক্যাপ্টেন, তাই না?

ইয়েস, কমোডোর। বিশাখাপট্টমে পাকিস্তানের সাব-মেরিন গাজীর পেছনে তখন ধাওয়া করার দায়িত্ব পড়েছিল আমার। বললেন ক্যাপটেন সিং।

ঠিক তাই। তাহলে বলুন, আমার স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে।

কমোডোরের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

বছর তিরিশ বয়েস ক্যাপটেন মহীন্দর সিংএর। প্রায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা। তাঁর অত্যন্ত ঋজু গঠনের মধ্যে ছিল আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। মুখে অনাবীল সারল্য। প্রথম পরিচয়েই মনে হয়, এ

মানুষটি নিমেষে সবাইকে আপনার করে নিতে পারে।

ভাল কথা, ক্যাপ্টেন মির্জার কাছে শুনলাম আজ সকালের দিকে নাকি আপনার সাবমেরিনের কম্পাসটি হঠাৎ বিকল হয়ে গিয়েছিল? ব্যাপার কি বলুন তো? আগে থেকে কি চেক আপ করা ছিল না? কমোডোর প্রশ্ন করলেন।

ভিশাখাপট্টম থেকে যাত্রা করার সময় সব কিছুইতো চেক আপ করেছিলাম ক্যাপ্টেন। আমাদের ইঞ্জিনিয়ার টেস্ট সার্টিফিকেটও দিয়েছিলেন। কিন্তু আজই হঠাৎ না, সকালের দিকে নয়, আমার মনে হয় তুপুর তুটো আড়াইটার সময় হবে। শেষ বারের মত সব পরীক্ষা করতে গিয়ে লক্ষ করলাম আমার সাব মেরিনের তুটি যন্ত্র ঠিক মত কাজ করছে না।

তুটি যন্ত্র মানে? কমোডোর চমকে উঠলেন যেন।

হ্যাঁ তুটি যন্ত্রই কমোডোর। একটি কম্পাস। আর একটি ম্যাগনেটিক ডেফ্‌থ মিটার।

ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর কথায় এবার সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

ডঃ রামচন্দ্রন প্রশ্ন করলেন, ক্যাপ্টেন সিং তাহলে আপনি বলছেন সমুদ্রের গভীরতা মাপার চৌম্বক যন্ত্রটিও বিকল হয়ে গিয়েছিল?

ইয়েস ডক্টর। ক্যাপ্টেন সিং?

বেশ আশ্চর্যজনক ব্যাপার। বললেন ডঃ দত্ত।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা নীরব রইলেন।

মনে হল এবার যেন কমোডোর নিজেও খানিকটা চিন্তিত। তাঁর ধারণা ছিল, বিশেষ এই ডুবো জাহাজটির যন্ত্রপাতি যতটা নির্ভরযোগ্য, আর কোন ডুবো জাহাজের যন্ত্রপাতি তেমনটি নয়। যে কোন অভিযানের গোড়ায় এমন সব বাধার কথা শুনতে কোন দিনই তিনি অভ্যস্থ নন।

টু ব্যাড ক্যাপ্টেন সিং। ফিরে গিয়ে আমি নোট পাঠাব আমাদের ইলেকট্রনিকস ডিভিশনের আরও তৎপর হওয়া উচিৎ। তবু ভাল,

ভুলভ্রান্তি যা কিছু জলের ওপরে ঘটেছে। জলের নিচে এসব ত্রুটি ঘটলে, কি হত বলুন দেখি? যাই হোক, এখন সব ঠিক ঠাক কাজ চলছে তো?

এখন তো দেখছি কোন গোলমালই নেই। বললেন ক্যাপ্টেন সিং।—মানে গোলমাল বলতে যা বলতে চাইছি সেটা অন্য রকম, কমোডোর।

তার মানে? কমোডোরের কণ্ঠে বিস্ময়।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রার দৃষ্টিতে কৌতূহল।

মানে, বললেন ক্যাপ্টেন সিং, ঘণ্টাখানেকের জন্যে কম্পাসটি ঠিক মত দিক নির্ণয় করছিল না। যে দিকটা উত্তর, অথবা দক্ষিণ, সে দিক থেকে তার কাঁটা বেশ খানিকটা সরে গিয়েছিল। বলতে কি, কমোডোর ব্যাপারটা চেক করতে গিয়ে আমাদেব ইঞ্জিনিয়ার তো রীতিমত অবাক। এক সময়ে দেখা গেল, কম্পাসের কাঁটা যে আসল দিক থেকে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাও নয়। বরং এলো পাথারি একবার বাঁদিকে, একবার ডান দিকে সরে যাচ্ছে। আবার কখনও স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর ওই যে গভীরতা মাপার যন্ত্রটা? ওর ব্যাপার দেখে মাথা আমারও খারাপ হয়ে গিয়েছিল, স্যার। আমাদের টেকনিক্যাল অ্যাসিট্যান্ট বলল, যে জায়গায় এখন আমরা রয়েছি সেখানকার গভীরতা নাকি একশ' ফুট। আমি ত' অবাক। তা কি করে হবে। চার্ট অনুযায়ী সেখানকার গফীরতা চল্লিশ ফুটের বেশি হওয়ার কথা নয়। ওঁকে বললাম, চলুন দেখি। কি ব্যাপার নিজের চোখে দেখা যাক। ওঁর সঙ্গে গেলাম। গিয়ে দেখি, যন্ত্রটি তখন যে রিডিং দিল, তাতে দেখা যাচ্ছে সেখানকার গভীরতা এক হাজার ফুঠ। পরক্ষণেই আর একটি রিডিং-এ দেখলাম এই হিসেব এসে দাঁড়িয়েছে তিরিশ ফুটে।

আশ্চর্য তো! ক্যাপ্টেন সিং-এর কথা শুনে খুব অবাকই হলেন ডঃ দত্ত।

তাহলে যন্তরটার গোলমালটা কি গিয়ে দাঁড়াল? কমোডোর।

সেটাই তো আরও আশ্চর্যের ব্যাপার কমোডোর, বললেন ক্যাপ্টেন সিং। টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট বারবার চেষ্টা করেও কি কম্পাস, কি ম্যাগনেটিক ডেফথ্ মিটারে কোন ত্রুটি ধরতে পারলেন না। বরং কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি মেরে কম্পাসের কাঁটা একান্ত বাধ্যের মত আবার ফিরে এসে ঠিক জায়গায় দাঁড়াল। মনে হল, কে যেন জবরদস্ত তাকে আটকে রেখেছিল। সেই আটক থেকে ছাড়া পেল সে। আর ও দিকটায় চৌম্বক যন্ত্রটি, মানে ওই ডেফথ্ মিটার আর কি, আবার সুবোধ বালক বনে গেল। আমি হলফ করে বলতে পারি। যন্ত্রগুলির মধ্যে কোন গোলযোগই ছিল না।

ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর কথা এতক্ষণ হাঁ হয়ে শুনছিলেন ডঃ রামচন্দ্রন। এবার তিনি মন্তব্য করলেন, ইটস এ স্ট্রেঞ্জ ফেনমেনন ইন দিস পার্ট অভ্ ইণ্ডিয়ান ওসেন। মেরু অঞ্চলে অনেক সময় এমনটি ঘটে। হঠাৎ মহাজাগতিক রশ্মির বর্ষণ বেড়ে গেলে কখনও কখনও সেখানকার চৌম্বক ক্ষেত্র দারুনভাবে বিপর্যস্ত হয়। তার প্রভাবে চৌম্বক যন্ত্রপাতি খানিকটা বিকল হয়ে পড়ে।

ঠিক। আপনি ঠিকই বলেছেন, ডঃ রামচন্দ্রন। অবশ্য সমুদ্রের কোন কোন জায়গায় জলের নিচে শক্তিশালী চুম্বক-পাহাড় দেখা যায়। সে ক্ষেত্রেও আপনি এ ধরণের ব্যাপার ঘটতে দেখতে পারেন। কিন্তু যতদূর জানি, ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে তেমন তো কোন সম্ভাবনা থাকার তো কথা নয়? ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, আপনি কিছু বলবেন? এক নাগাড়ে কথা বলবেন ডঃ দত্ত।

ডঃ দত্তের এই প্রশ্নে মনে হল, ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ যেন মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলেন। চমক ডঃ বাসু এবং সুমিত্রারও চোখে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই সামলে নিলেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

বললেন, আমিও তাই ভাবছি। মনে হচ্ছে যান্ত্রিক কোন ত্রুটি ঘটেছিল। আবার আপনা থেকেই সে ত্রুটি দূর হয়েছে। অনেক

সময় ট্র্যানজিসটার সেটেও এমনটি দেখা যায়। রেডিও বাজছে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর একটু ঝাঁকুনি পেতেই আবার চালু হল সেটি।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের বলার ভঙ্গী দেখেই মনে হল তিনি যেন জোর করে একটা যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছেন।

না, স্যার। এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম। দুটি যন্ত্রই আমরা দারুণভাবে আগে থেকেই পরীক্ষা করে নিয়েছিলাম। বললেন ক্যাপ্টেন সিং।

এ সব কথা এখন থাক। যন্ত্র দুটি চালু হয়েছে, এই ঢের। এখন আর সময় না নষ্ট করে চলুন দেখি, যে কাজটির কথা বলছিলাম সেরে ফেলি। বলেই কমোডোর ব্যানার্জি তাঁর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

তাই ভাল। ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

এর পর সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ক্যাপ্টেন মির্জা বললেন, আমার সঙ্গে আসুন আপনারা। হ্যাঁ, এই দিকে। স্পিড বোট আপনাদের জন্যে প্রস্তুত।

তাঁরা একে একে ক্যাপ্টেন মির্জার ক্যাবিন থেকে নেমে এলেন ডেকের ওপর। সমুদ্রের এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল তাঁদের চোখে মুখে।

চমৎকার আবহাওয়া। বলল সুমিত্রা।

সমুদ্রও নিস্তরঙ্গ। ডঃ বাসু।

জাহাজের পাশে ঝোলান দড়ির সিঁড়ি বেয়ে একে একে নেমে এলেন সবাই। নীচে ভেলার মত ভাসছে সাদা রঙের স্পিড বোট। খুদে বোটটিকে দেখে মনে হল যেন শুভ্র রাজহাঁস।

স্পিড বোটে এসে এক একটি আসন দখল করে বসলেন সবাই।

ক্যাপ্টেন মির্জা বললেন, তাহলে এগুচ্ছি আমরা। ডঃ বাসু, আপনি দয়া করে এখানকার ম্যাপটি খুলে আমার পাশে বসুন। বলুন, কোন পথে আমাকে যেতে হবে।

ডঃ দত্ত বললেন, আমিও আপনাদের সাহায্য করছি।

স্পিড বোট ছুটে চলল।

প্রথমে সোজা পুব দিক বরাবর। মাইল তিনেক।

তারপর উত্তর দিকে মুখ করে আরও তিন মাইল।

জল।

শুধু জল।

জোয়ার চলছে তখন। তাই আশপাশে দু-একটি পাহাড়ের ডগা ভাঁটার সময় সমুদ্রের বুকে মাথা উঁচু করে থাকত, এখন তারা জলের নিচে ডুবে গেছে।

নতুন কোন বৈচিত্র্য দেখা গেল না।

শুধু।

হ্যাঁ, খানিকটা কৌতুক মেশান কণ্ঠস্বরে ডঃ দত্ত বললেন, দেখুন, দেখুন। সমুদ্রের ওপর কি বিরাট এক একটি ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে, দেখছেন ডঃ রামচন্দ্রন ?

কমোডোর এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। আসলে স্পিড বোটে ওঠার পর থেকে এ পর্যন্ত তিনি ঠাঁয় চুপ করে বসেছিলেন। স্পিড বোটের গতির সঙ্গে হয়ত তিনি দেখে যাচ্ছিলেন চারপাশটা। অথবা পরিকল্পনা যে সব মাথার মধ্যে পুরে রেখেছেন সেগুলি ঝালিয়ে নিচ্ছিলেন।

ডঃ দত্তের কথায় সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

শুধু একজন ছাড়া।

অদ্ভুতই বটে। কম করেও প্রায় দুই বর্গমাইল জায়গা জুড়ে সমুদ্রের বুকে ভেসে রয়েছে বড় বড় এক একটি ফেনা। এই তো, তাদের ধার ঘেঁষেই তো স্পিড ভেসে চলেছে। পড়ন্ত রোদের তির্যক রশ্মি তাদের ওপর প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব এক শোভা সৃষ্টি করেছিল। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন হংস বলাকা।

সুমিত্রা বলল, ইট্‌স লাভলি।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, স্থলভাগ থেকে এত দূরে সমুদ্রের জলে ফেনা। আশ্চর্য। সম্ভবতঃ কোন কারখানার জঞ্জাল সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশে ফেনাগুলি তৈরি করে থাকবে।

কোন জাহাজ দুর্ঘটনার ফলেও হতে পারে। যেমনটি ঘটেছিল উত্তর আতলান্তিক এবং উত্তর মহাসাগরে কয়েক বছর আগে। আপনার হয়ত মনে আছে, ড. রামচন্দ্রন, উত্তর মহাসাগরে সমুদ্রের নীচ থেকে তেল তোলার যে কেন্দ্রটি ব্রিটেন স্থাপন করেছে, সেবার সেই কেন্দ্র থেকে তেল আনতে গিয়ে একটি ট্যাঙ্কার ফেটে যায়। সেই তেল সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বললেন ডঃ দত্ত।

তা শুধু তেলই বা কেন। ওদিকে উত্তর আমেরিকা এদিকে ইউরোপ এদের যত সব কারখানার জঞ্জাল তো এখন সারা আতলান্তিক এমন নরক কুণ্ড করে রেখেছে। ডঃ রামচন্দ্রন।

কমোডোর ব্যানার্জি চুপ করে ওঁদের কথাবার্তা শুনছিলেন।

তিনি মন্তব্য করলেন, আতলান্তিকে না হয় হল, কিন্তু ভারত মহাসাগরে এমন ব্যাপার তো ঘটার কথা নয়। এ অঞ্চলে তেমন কোন কারখানা নেই।

কমোডোরের কথায় যেন চমকে উঠলেন ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ। মনে মনে শঙ্কিত হয়ত। ভাবলেন, এই না হলে ফৌজি অফিসার। বুদ্ধি বটে। প্রতিটি পরিস্থিতি কেমন ঠাণ্ডা মাথায় যাচাই করে নিচ্ছেন কমোডোর।

ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ, আপনি কিন্তু তখন থেকে চুপ করে বসে আছেন। কিছু একটা বলুন। এবার প্রফেসারের দিকে চাইলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

ততক্ষণে ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিজ নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি বললেন, বলা শক্ত। তবে আমার মনে হচ্ছে, কোন জাহাজ টাহাজের জঞ্জালই হবে হয়ত। ডঃ দত্ত, আপনার কি মনে হয়?

আমারও তাই মনে হচ্ছে। ডঃ দত্ত।

বলেই তিনি পাইলটকে বললেন, দয়া করে একটি ফেনার পাশে স্পিড বোটটাকে দাঁড়করান তো ?

যেন হাতুড়ির ঘা পড়ল ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচের বুকে।

পাইলট একটি ফেনার পাশে নিয়ে এসে স্পিড বোটটিকে দাঁড় করালেন।

ডঃ দত্ত ফেনাটিকে ভাল করে দেখতে লাগলেন।

কি মনে হচ্ছে আপনার ? জিজ্ঞেস করলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

সবার দৃষ্টিই তখন ওই একটি মাত্র ফেনার ওপর নিবদ্ধ।

কয়েক মুহূর্ত ধরে বাজ-পাখীর চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে ডঃ দত্ত বললেন, কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে না ? দেখুন দেখুন ডঃ বাসু, ফেনা তো নয়। যেন প্লাস্টিকের ফোঁপড়া। মৌমাছির চাকের মত কেমন খুদে খুদে ঘর দেখতে পাচ্ছেন। আর এক একটি কক্ষের ওপর কেমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালো কাজ। যেন মনে হয় কে যেন কালো কালির পোঁচ মেরে শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছে।

সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়।

প্রায় দশ ফুট ব্যাসের একটি ফেনা। জলের ওপর প্রায় ফুট দুই মাথা উঁচিয়ে ভেসে রয়েছে। ওপর থেকে দেখতে কতকটা মৌমাছির চাকের মতই দেখাচ্ছিল। রঙটা শুধু সাদা। সমুদ্রের ওপর ভেসে থাকা সত্ত্বেও তার ওপরের অংশে জলের ছিটে ফোঁটা অবধি দেখা গেল না।

আশ্চর্য। এই কারণেই বলে প্রকৃতিই বড় শিল্পি। তাই কখনও কখনও একটি পাহাড়ের ডগাকে দেখলে মনে হয় দেবতার মুখ। মাথার ওপর ভাসমান মেঘের মধ্যে জেগে ওঠে কোন দেশের মানচিত্র।

ডঃ দত্ত বললেন, দাঁড়ান। একটা ফেনা সংগ্রহ করতে হবে। হয়ত কোন কারখানা থেকে এমন কিছু জঞ্জাল জলে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, যা জলের মধ্যে মিশে থাকা রাসায়নিক সামগ্রীর সঙ্গে মিশে প্রায় প্লাস্টিকের মত কোন বস্তু তৈরি করে থাকবে। বলতে কি, বহুদিন সমুদ্র নিয়ে আমার কারবার মশায়। সমুদ্রে ভেসে যাওয়া

বহুৎ জঞ্জাল আমি দেখেছি। কিন্তু এমনটি কখনও চোখে পড়েনি। আমার মনে হয় এর নমুনা বিশ্লেষণ করা উচিত।

ঠিক কথা, মন্তব্য করলেন ডঃ রামচন্দ্রন।—সর্বনাশ, এত বড় বড় ফেনার চাক যদি পৃথিবীর সব সমুদ্রের ওপর ভাসতে থাকে, অবস্থাটা কেমন দাঁড়াবে বুঝতে পারছেন। সমুদ্রের জলে ঠিকমত সূর্যের আলো গিয়ে পৌছবে না। না পারবে অকসিজেন জলের সঙ্গে মিশতে। তার মানে সমস্ত মাছ আর জলজ উদ্ভিদ একেবারে সাবাড়!

ডঃ দত্ত ততক্ষণে একটি লাঠির ডগা দিয়ে ফেনাটি স্পিড বোটের কাছে টেনে আনার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু।

কয়েক মুহূর্ত মাত্র।

হঠাৎ ফস করে একটি শব্দ হল।

আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ফেনাটা চুপসে গেল। শুধু তাই নয়, অমন মৌমাছির মত চাকটি মনে হলো ক্রমেই ছিবড়ে হয়ে সমুদ্রের জলে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে।

এমন যে ঘটতে পারে ডঃ দত্ত ভাবতেও পারেন নি। তিনি ভেবেছিলেন বিচিত্র ওই বস্তুটিকে ডাঙ্গায় নিয়ে বিজ্ঞানীদের তাক লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু তখন একটি ঘটনায় দমে গেলেন তিনি।

তখন ফেনার ওপর সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। যদি কেউ লক্ষ করতেন, দেখতেন, হঠাৎ এই ঘটনায় ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের সারা মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কামাডোর ব্যানার্জি এতক্ষণ আগের মতই নিশ্চুপ বসে এই বুড়ো শিশুদের কাজকর্ম লক্ষ করছিলেন। কোন কথা বলেন নি। কিন্তু ফেনাটি ওইভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এবার খানিকটা যেন বিরক্ত হলেন তিনি।

আপনারা কি সব করছেন, বলুন তো মশায়? ছেলেমানুষ হলেন নাকি সব। ঢের হয়েছে ফেনা নিয়ে কারবার। এবার ছাড়ুন দেখি

পাগলামী। আপনাদের বিজ্ঞানীদের নিয়ে পারা যায় না। সব কিছুতেই আপনাদের কৌতূহল। কোথায় আমরা চলেছি এক কাজে, আপনারা পড়লেন ফেনা নিয়ে।

কমোডোরের মন্তব্যে হেসে উঠলেন সবাই।

ফেনার নমুনা আর নেয়া হল না।

এরপর আরও প্রায় একঘণ্টা ধরে সমুদ্রের ওই অঞ্চলে ঘুরে সবাই জাহাজে ফিরে এলেন। ঘড়িতে তখন প্রায় সাতটা।

যৎসামান্য বিশ্রাম করার পর ডিনার পর্ব শেষ হল।

কমোডোর বললেন, ধকল অনেক গেছে আজ। স্যারস, আপনারা বিশ্রাম করুন আজকের মত কাল সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট। তারপর আধঘণ্টা আমরা একটা কনফারেন্স সেরে নেব। এবং আমাদের অভিযান সুরু হবে ঠিক পৌনে ন'টা থেকে।

মনে হল কমোডোর ফৌজি আদেশ দিলেন।

তাঁকে বেশ চিন্তিতও মনে হচ্ছিল।

কথা বলার পর কমোডোর আর অপেক্ষা করলেন না। —শুভ রাত্রি! তিনি নিজের ক্যাবিনে চলে গেলেন। সেই সঙ্গে গেলেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-ও।

কমোডোর চলে যাওয়ার পর, প্রথম কথা বললেন ডঃ বাসু। —আজকের রাতটা বড় সুন্দর। ক্যাপ্টেন মির্জা।

হঠাৎ এমন একটি প্রসঙ্গ উঠতেই মৃদু হাসলেন ক্যাপ্টেন মির্জা।—

সমুদ্রের বুকে প্রথম দু তিন দিন সবার কাছেই সব রাত সব দিন সুন্দর বলেই মনে হয়, ডক্টর। তারপর দিনের পর দিন যত তার সঙ্গে পরিচয় ঘটে, ততই কি মনে হয়, জানেন। যেন এক নায়িকা। তার আচরণে কখনও মাদকতা, অস্বাভাবিক আকর্ষণ, যেন একান্ত আপনার। কিন্তু সেই একান্ত জনই কখন যে কালনাগিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। কেউ বলতে পারে না। মোহিনী সমুদ্র তখন শয়তানী। ওকে আমরা চিনে ফেলেছি। তাই আর মাথা ঘামাই না।—তারপর

সুমিত্রার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, মাফ করবেন, ডঃ মালহোত্রা।

অপূর্ব! বললেন ডঃ বাসু।

না, না! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছিল আপনি একজন কবি ক্যাপ্টেন মির্জা। সুমিত্রা হেসে জবাব দিল।

ধন্যবাদ। ক্যাপ্টেন মির্জা।

ডঃ বাসু বললেন, এখন তো সবে রাত ন'টা। চলুন না ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ, সুমিত্রা তুমিও আসতে পার। আকাশে চাঁদ। পরিষ্কার আকাশ। এমন সময়ে সমুদ্রের শোভা না দেখে এখনই আমি ঘুমোতে চাই না।

বেশ তো আপনারা ডেকের ওপর একটু বেড়িয়ে নিন। ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ দত্ত, আপনারাও যেতে পারেন। বললেন ক্যাপ্টেন মির্জা।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, না। আমি ক্লান্ত। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কথা আলাদা। উনি চির তরুণ। আর সুমিত্রা এবং ডঃ বাসু, দে আর স্টীল ইয়ং। আর ডঃ দত্ত—? ডঃ দত্তের দিকে চাইলেন তিনি।

ডঃ দত্ত সজোরে ঘাড় নেড়ে বললেন না মশায়। আপনারাই বরং একটু হাওয়া খেয়ে আসুন। সমুদ্রে আসাটা এই আমার প্রথম নয়। ও সব ঢের দেখেছি।

এমন ভাবে কথা বললেন ডঃ দত্ত যেন পালাতে পারলে বাঁচেন।

যে যাঁর ক্যাবিনে চলে গেলেন।

শুধু ওঁরা তিন জন।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ, ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা।

তিনজন নেমে এসে ডেকের এক কোণে দাঁড়ালেন।

কয়েকমুহূর্তের জন্য কেউ কোন কথা বললেন না।

উন্মুক্ত সমুদ্রের বুকে তখন নেমে এসেছে অশরীরি এক মায়াবী পরিবেশ। অদূরে সেই তিন নম্বর দ্বীপ। বরং বলি পাহাড়। তার

গায়ের ওপর আছড়ে পড়ছে প্রথম জোয়ারের বড় বড় ঢেউ সেই ঢেউ-এর শব্দই যেন ওই সমুদ্রের মাঝে জীবনের অস্তিত্বকে ঘোষণা করার একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছে। দক্ষিণ দিক থেকে একটু জোরে বাতাস বইছিল। আর ঢেউ-এর তালে তালে জাহাজটি দুলছিল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

কিছুক্ষণ বিরতির পর প্রথম কথা বললেন ডঃ বাসু, ফেনাগুলি কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছিল, তাই না সুমিত্রা ?

কিন্তু সুমিত্রা কোন কিছু মন্তব্য করার আগেই ডঃ অ্যাণ্টো-নিয়েভিচ বললেন চুপ। ও নিয়ে কোন কথা নয়। এমন ভাবে বললেন, যেন দারুণ অপরাধ করে ফেলেছেন ডঃ বাসু হঠাৎ এমন একটি প্রশ্ন করে।

ব্যাপার কি প্রফেসর ? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলেন ডঃ বাসু।

এটাই শেষ পরীক্ষা, ডঃ বাসু। আমার মনে হচ্ছে শেষ পর্যন্ত উনি যা চেয়েছিলেন, পেয়ে গেলেন। বললেন অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

আপনি বলছেন ওই ফেনাগুলি জঞ্জাল নয় ? সুমিত্রার প্রশ্ন।

ডঃ বাসু সুমিত্রার কাঁধে চাপ দিলেন। —বললেন, তোমাকে বলা হয়নি এ কথাটা। এখন আর বলা উচিত নয়। কে কোথায় শুনবে। পরে বলব।

না, জঞ্জাল নয়। গম্ভীর শোনাল অধ্যাপকের কণ্ঠস্বর।

পাইলট ক্যাবিন থেকে কে যেন কথা বলল। হয়ত নাবিকরা নিজেদের মধ্যে গল্প করছে।

অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ বললেন, চল। এবার শুয়ে পড়া যাক।

সুমিত্রাকে তার ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে ওঁরা দুজন নিজেদের ক্যাবিনে গেলেন। রাতের মত বিদায় নেবার সময় অধ্যাপক অ্যাণ্টো-নিয়েভিচ বললেন, অসামান্য সাফল্য ডঃ বাসু। ওই ফেনা ভবিষ্যতে ইলেকট্রনিকস ব্যবস্থায় এক বিস্ফোরণ ঘটাবে। মাথা বটে লোকটার। ও, কে। গুড নাইট।

গুড নাইট। বলেই ডঃ বাসু ক্যাবিনের দরজা বন্ধ করে দিলেন।

পরদিন অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচের যখন ঘুম ভাঙ্গল পূবের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে উঠেছে। মাথার ওপর অন্ধকারের কালো পর্দা দ্রুত অপসৃত হয়ে ফুটে উঠতে শুরু করেছে নীল আকাশের চাঁদোয়া। একটি বা দুটি নক্ষত্র। নিভন্ত। পূর্ব দিগন্তে আবীরের ছটা। সেই ছটা ভারত মহাসাগরের এক একটি ঢেউ-এর চূড়ায় যেন লাস্যময়ী সৌন্দর্যের অপূর্ব স্বর্গ। সমুদ্রের বুক চিরে সূর্য উঠবে হয়তো আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

ঘুম থেকে উঠেই ঘড়ি দেখলেন অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

ইস্‌। পাঁচটা বেজে গেছে? তার অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

শয্যা ত্যাগ করে ক্যাবিনের জানালা পথে বাইরের দিকে চোখ বাড়ালেন তিনি।

না। জাহাজ তখনও নীরব। দু একজন ছাড়া এখনও পর্যন্ত কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি মনে হচ্ছে। মাস্তুলের ওপর লাল-নীল আলোর সংকেত তখনও জ্বলছিল। জাহাজের ডগায় একজন মাল্লা। অত ভোরে কি করছে কে জানে। জাহাজ থেকে প্রায় তিনশ গজ দূরে সমুদ্রের বুকে ভেলার মত ভাসছে ডুবো জাহাজটা আর সে দিকে চাইতেই অধ্যাপকের মুখ খুশিতে ভরে উঠল।

ওই তো। ডুবো জাহাজটার পাশে ঢেউ-এর ওপর ভেসে রয়েছে, হ্যাঁ দূর থেকে মনে হচ্ছে। যেন একটি একটি রাজহাঁস। অথবা প্রস্ফুটিত পদ্ম কিন্তু তা তো নয়। সেই ফেনা। গতকাল বিকেলের দিকে ডঃ দত্ত যা নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছিলেন।

যাক। তাহলে আপাতত সব ঠিক ঠাক চলছে। মনে মনে বললেন অধ্যাপক। তারপর হ্যাঙ্গার থেকে সেই চীতাবাঘ মার্কা কোটটি পেড়ে পরে নিলেন তিনি। কলারটি খাড়া করলেন। বুক পকেট থেকে বের করে নিলেন কালকের সেই চাকতিটা। চাকতির এক পাশে লাগানো একটি বোতাম টিপলেন।

সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর ভেসে উঠল লাল নীল সবুজ রঙের আলোর অসংখ্য ফুটকি। ফুটকিগুলি পর্যায়ক্রমে জ্বলতে ও নিভতে শুরু করল।

অধ্যাপক পরপর কয়েকবার বোতামটি টিপলেন।

আলোর ফুটকি নিভে গেল এর পর।

অধ্যাপক এবার বাথরুমে গেলেন। সকাল ছটার মধ্যে স্নান পর্ব শেষে জামা কাপড় পরে নিলেন। চীতাবাঘ মার্কা কোটটিকেও পরলেন।

এবার আজকের কর্মসূচী প্রসঙ্গে কিছুটা আগাম চিন্তা।

কমোডোর ব্যানার্জির পরিকল্পনা কি এখনও জানা যায় নি। তবে অনুমান করা শক্ত নয়, ডঃ দত্তের ওপর দায়িত্ব থাকবে সমুদ্রের নিচের স্রোতের ওপর নজর রাখা। ডঃ রামচন্দ্রন মনে হচ্ছে ভারত সরকারের বিজ্ঞান দপ্তরের পক্ষ থেকে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা নেবেন। ডঃ বাসুর ওপর দায়িত্ব থাকবে ভূ-পদার্থ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের। সুমিত্রা তাঁকে সাহায্য করবে। আর আমি অধ্যাপক অ্যান্টো-নিয়েভিচ আন্তর্জাতিক পারমাণবিক সংস্থার পর্যবেক্ষক।

হ্যাঁ, পুরো ব্যাপারটা এই ভাবেই খতিয়ে একবার ভেবে নিলেন তিনি। আসল কথা, যা করতেচলা হচ্ছে, সে তো আর গবেষণা নয়? নেহাৎ অনুসন্ধানের কাজ। বোঝাই যাচ্ছে কমোডোর এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞান নিয়ে ততটা ভাবছেন না। ওঁর ভাবনা সমুদ্রের নিচে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে হয়ত সাপের সাক্ষাৎ পাবেন তিনি।

কিন্তু সেই ডলফিনটা? ডলফিনটা শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব পালন করতে পারবে তো? যদি এতটুকু সে ভুল করে, এতগুলি মানুষ সমুদ্রের গভীরে কবরস্থ হবে। সেই সঙ্গে এত বড় একটা সম্ভাবনা সাফল্যের শেষ সীমায় এসে ভেস্তে যাবে।

ক্রিং, ক্রিং…

টেলিফোন শব্দ করে উঠল। অধ্যাপক রিসিভারটি কানে তুলে নিলেন।

• হ্যালো! ও, গুড মর্নিং কমোডোর।—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। ডাইনিং রুমে তো? ব্রেকফাস্ট রেডি? ওয়ানডারফুল! আমি এখুনি আসছি। ও, কে,। নো প্রোবলেম।

রিসিভারটি নামিয়ে রেখে অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ ডাইনিং রুমের দিকে পা বাড়ালেন। খানতিনেক ক্যাবিন পেরিয়ে তিনতলায় খাবার ঘর। পৌঁছতে দু মিনিটও লাগল না।

এর মধ্যে সবাই ডাইনিং রুমে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

সো এভরিথিং ও, কে। মুখের ওপর অনাবিল হাসি ছড়িয়ে অধ্যাপক এ্যান্টোনিয়েভিচ কথা বললেন।

মনে হচ্ছে তো তাই, প্রফেসর! তবে—কথা বলতে গিয়ে থামলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

এনি থিং রং? নিজের আসনে বসে এক গেলাস লেবুর রস তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলেন অধ্যাপক।

আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না। ক্যাপ্টেন মির্জা বলছেন, আমাদের এই জাহাজের রেডিও অপারেটার গতকাল রাতের দিকে এবং আজ সকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ একটা ভৌতিক বেতার সংকেত ধরতে পেরেছেন। দীর্ঘ তরঙ্গের বেতার তরঙ্গ। ওর ধারণা কাছাকাছি কোন জায়গা থেকেই সংকেত ভেসে আসছিল।

সে আবার কি কথা। ডঃ বাসুর কণ্ঠে চমক।

আমিও তাই ভাবছিলাম, ডঃ বাসু। কিন্তু একবার হলে না হয় কথা ছিল। পরপর দুবার যখন তখন এ ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরক্ষা বিভাগের লোকেরা এ সব ব্যাপার হালকা করে দেখতে অভ্যস্থ নই। বললেন কমোডোর।

অনেক সময় নৈসর্গিক কারণেও রেডিও সিগন্যাল ধরা পড়ে। ধরুণ ওই সংকেত হয়ত দূরবর্তী কোন রেডিও তরঙ্গ পাঠায় এমন নক্ষত্র থেকে ভেসে এসেছিল? অবশ্য অনেক সময় রেডিও নয়েজকেও রেডিও সিগন্যালের মত শোনায়। সূর্যে হঠাৎ বড় রকমের বিস্ফোরণ

ঘটলে প্রায়ই তো আমরা রেডিও নয়েজ শুনে থাকি, তাই না, ডঃ দত্ত ?' মন্তব্য করল সুমিত্রা।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের ঠোঁটের ডগায় তখনও ফলের রসের গেলাসটি স্পর্শ করে রয়েছে। সবই শুনছিলেন তিনি। মনে মনে শঙ্কিত হচ্ছিলেন। কিন্তু ভাবটা এমন দেখাচ্ছিলেন, পৃথিবীতে ঠিক এই মুহূর্তে একমাত্র চিন্তা যার জন্যে করা যায় তা সে ওই ফলের রস। যাক সুমিত্রা ঠিক মতই এগোচ্ছে। অর্থাৎ এবার থেকে এই সব প্রতিরক্ষা লোকেদের সঙ্গে এমনভাবে ডায়লগ চালাতে হবে যাতে করে ওদের স্বাভাবিক চিন্তা ভাবনাটা একটু গুলিয়ে যায়। সুমিত্রা কাজটা ঠিকমত শুরু করেছে। অধ্যাপক একবার আড়চোখে চাইলেন সুমিত্রার দিকে।

ডাঃ দত্ত কিন্তু সুমিত্রার কথায় প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আপনি যা বলতে চাইছেন ডঃ মালহোত্রা, সে ক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক কম হবে। কম্পাসও হবে অনেক বেশি। কিন্তু এখানে তেমন তো ঘটেনি ?

ঠিক কথা। বেশ গুরুত্বের সঙ্গে কথা বললে যেমনটি শোনায় সেই ভাবেই যেন মন্তব্য করলেন প্রফেসর।

তাহলে আপনি বলছেন ব্যাপারটা গোলমেলেও হতে পারে ? কমোডোরের প্রশ্ন।

না। সে কথা আমি বলি নি। আমি বলতে চাই, এ ধরণের ঘটনার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে এটা সাহায্য করতে পারে। অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

অধ্যাপকের কথায় কমোডোর যে খুব খুশি হলেন না সে তাঁর মুখ দেখেই বোঝা গেল।

খনিক বিরতি।

ব্রেকফাষ্ট শেষ হল আধঘণ্টার মধ্যেই।

আর তারপরই রেডিও অফিসার এসে জানালেন, ডুবো জাহাজ

প্রস্তুত। ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

ঘড়িতে তখন আটটা বেজে পনের।

কমোডোর বললেন, স্যারস, এবার চলুন। আসল কাজ আমরা শুরু করি।

কমোডোরের পেছনে পেছনে সবাই নেমে এলেন ডেকের ওপর। তারপর সিঁড়ি বেয়ে নিচে একটি মোটর লঞ্চে। অতঃপর সেই ডুবো জাহাজ।

কিন্তু সেখানে এসেও আবার যেন এক চমক।

কমোডোর, দেখুন। সেই ফেনা এখানেও ভাসছে। বললেন ডঃ দত্ত।

থামুন আপনার ফেনা নিয়ে ডঃ দত্ত আমরা কেউ এখন জলের জঞ্জালের কথা ভাবছি না। ওসব যেতে দিন তো? যে জন্যে এখানে আসা সে কাজটা শেষ করি তারপর প্রাণ ভরে যাতে আপনি ফেনা সংগ্রহ করতে পারেন তার সে ব্যবস্থা আমি করে দেব। বললেন কমোডোর। মনে হল তিনি যেন বিরক্ত। সম্ভবত সেই ভৌতিক বেতার তরঙ্গের ব্যাপারটা তখনও পর্যন্ত তাঁকে চিন্তিত করে রেখেছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করলেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ। আর মনে মনে খুশি হলেন এই ভেবে, মানুষ যখন কোন ব্যাপারে বিরক্ত হয়, বুঝতে হবে সে ক্ষণিকের জন্যে আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। আর কেউ যখন আত্মবিশ্বাস হারায় তখন কাজের মধ্যে সে খেই হারিয়ে ফেলে। অতএব শক্ত মানুষ কমোডোরকে বাগে রাখা শক্ত হবে না।

কমোডোর সদলবলে ডুবো জাহাজে গিয়ে যখন পৌঁছলেন ঘড়িতে তখন ন'টা। ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং জানালেন, সমস্ত কিছুই প্রস্তুত।

কমোডোর বললেন, আসুন, আমাদের গতিপথের মানচিত্রটি একবার দেখে নেয়া যাক।

অদ্ভুত পুলকিত বাঁকি সবাই। বিশেষ করে সুমিত্রা এবং ডঃ বাসু তো বটেই। ডুবো জাহাজে চড়ার অভিজ্ঞতা এই প্রথম তাঁদের জীবনে ঘটল। ওঁরা তাই খুঁটিয়ে ভেতরের চারপাশটা দেখে নিচ্ছিলেন। দেখে নিচ্ছিলেন নেভিগেশন ক্যাবিনের সব কিছু।

মহীন্দর সিং একটি ছোট টেবিলের ওপর যে পথ ধরে অভিযান চালান হবে মাচিত্রের ওপর পেন্সিল টেনে বোঝাতে লাগলেন।

বিপজ্জনক পথ। জলের ওপর যেখানটায় ডুবো জাহাজটি ভাসছে ঠিক সেখান থেকে কম করেও প্রায় একমাইল দূরত্ব তাঁদের প্রথমে দক্ষিণ বরাবর পিছিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে ডুবে প্রায় তিনশ ফুট গভীরে নামতে হবে তারপর।

কমোডোর বললেন, এখান থেকে আমরা যাব সোজা পুব দিকে। আমার মনে হয় প্রায় একমাইল তো বটেই।

ডঃ দত্ত বললেন, সেটা সম্ভব নয় কমোডোর ব্যানার্জি। দাঁড়ান, আমার ম্যানুয়েলটা একটু দেখে নিই।

বলেই পকেট থেকে ছোট একটি নোট বই বের করে হিজিবিজি কি সব লেখা দেখে নিলেন তিনি। অবশিষ্ট সবাই তাঁর দিকে রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে রইলেন।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছি। মানচিত্রের ওপর আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে কথা বললেন ডঃ দত্ত।—এই যে দেখছেন, মানে বলছিলেন না, যেখানে তিনশ' ফুট জলের গভীরে নেমে সোজা পুব দিকে যাবেন —আপনি তা করতে পারেন না, কমোডোর ব্যানার্জি।

কেন? কমোডোর সপ্রশ্ন হলেন।

সোজা কথা। ম্যাপটার ওপর চোখ বোলান একটু। এই যে দেখছেন—হ্যাঁ সোজা পুব দিকে গেলে এ জায়গাটার দূরত্ব দাঁড়াবে সিকি মাইলের মত। সমুদ্রের তিনশ' ফুট গভীরে এ সময় ওই জায়গা দিয়ে একটি শীতল স্রোত বয়ে চলে। না, ঠাণ্ডা বলে বলছি না। ভুতুড়ে এই স্রোতটি খুবই বিপজ্জনক। এটি বার্মার উপকূলের পাশ

দিয়ে এগিয়ে আসছে। বার্মা না বলে বরং বলি, দক্ষিণ মহাসাগর থেকে যাত্রা করে বার্মার উপকূল ছুঁয়ে বৃত্তের মত পথ তৈরি এই স্রোত ঠিক এই পথ দিয়েই আবার গিয়ে পড়ছে। এর গতি অনেক বেশি। একবার এর মধ্যে কোন ক্রমে যদি ডুবো জাহাজটি গিয়ে পড়ে, আমরা বিপদে পড়তে পারি।

কমোডোর খুব আগ্রহ নিয়ে ডঃ দত্তের কথাগুলি শুনছিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মুখের চেহারাটাও পালটে যাচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন সিং, আপনি কি মনে করেন, আপনার ডুবো জাহাজের পক্ষে ওই স্রোত অতিক্রম করা সম্ভব নয়, কমোডোর।

ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর মুখ দেখে মনে হল, এ ব্যাপারটা এর আগে তিনি ভেবে দেখেন নি। ডঃ দত্তের কথা শুনেই এর গুরুত্বটা উপলব্ধি করলেন এই প্রথম। অবশ্য, এটা তাঁর ভাবার কথাও নয়। কারণ কমোডোর ব্যানার্জি ঠিক যে কোন পথে তাঁর অভিযান চালাবেন সে কথা তো এখনও পর্যন্ত কাউকে বলেন নি তিনি?

কমোডোরের প্রশ্ন শুনে আর একবার ম্যাপটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিলেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং। সেই সঙ্গে ডঃ বাসু, সুমিত্রা এবং সকলে।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের চোখের মধ্যে যে এক ঝিলিক চমক খেলে গেল ডঃ বাসু এবং সুমিত্রার চোখে তা ধরা পড়ল।

আমার মনে হয় ডঃ দত্ত ঠিক কথাই বলছেন, কমোডোর। বললেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং।

কমোডোর বললেন, জানি না, মশাই। আপাততঃ ওই সব তত্ত্ব কথা ছেড়ে মোদ্দা কি করা দরকার একটু খোলসা করে বলুন দেখি।

সেটাই আমি বলতে যাচ্ছি, কমোডোর। ডঃ দত্ত।

মানচিত্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে তারপর বললেন, অসুবিধে কিছু নেই। যেখানে আমরা এখন রয়েছি সেখান থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণ দিকে ডুবো জাহাজটা নিয়ে যেতে হবে। তারপর পূর্ব দক্ষিণ

ধরাবর একটু পাশ কাটিয়ে উত্তর দিকে এগোলেই যে জায়গাটায় আপনি যেতে চান পৌঁছে যাবেন।

তাহলে সেটা করলেই তো হয়। বলেই ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর দিকে চাইলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

ইয়েস কমোডোর। কতকটা অ্যাটেশনের ভঙ্গীতে আদেশের প্রতীক্ষায় কমোডোরের দিকে চাইলেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং।

অতঃপর ডঃ দত্তের নির্দেশ মত যাত্রা শুরু হল।

বাঁ পাশে পড়ে রইল সেই তিন নম্বর দ্বীপ। ডুবো জাহাজ ক্রমে সমুদ্রের গভীরে ডুবে যাচ্ছে। একমাত্র ক্যাপ্টেন সিং, কমোডোর এবং ডঃ দত্ত ছাড়া এক একটি আসন দখল করে সবাই বসে রইলেন। ক্রু'রা যে যার কাজে ব্যস্ত। ভেতর থেকে শোনা যাচ্ছে বুদ বুদ এবং জলের সর সর শব্দ। এক মিনিটের মধ্যে সূর্যের আলোও নিভে গেল। পরিবর্তে গভীর জলের মধ্যে নেমে এল রাতের অন্ধকার। পোর্ট হোলের মধ্য দিয়ে। সুমিত্রা, ডঃ বাসু, ডঃ অ্যাণ্টোনিয়েভিচ এবং ডঃ রামচন্দ্রন বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন। ডুবো জাহাজের সার্চ লাইটে সামনের দিকটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

অতিক্রান্ত হল প্রায় দশ মিনিট।

এরপর মাইক্রোফোনে পাইলট ক্যাবিন থেকে কথা শোনা গেল। কমোডোর জানালেন এবার আমরা ডুববো। আরও গভীরে নামতে হচ্ছে আমাদের।

কমোডোরের কণ্ঠস্বরে যেন এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ।

সবাই রুদ্ধশ্বাস। প্রতিটি মুহূর্তে যেন নতুন উত্তেজনার স্বাদ।

নিচে। আরও নিচে। যাত্রীদের নিয়ে ডুবো জাহাজ গভীর সমুদ্রে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছে। পাশে, উপরে, নিচে—শুধু জল। কি অদ্ভুত বৈপরীত্য। মহাসাগরের উপরের অংশ কত চঞ্চল। কিন্তু এখানে, এই গভীর পরিবেশে মনেই হয় না, জল কখনও অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। পোর্ট হোলের মধ্য দিয়ে সার্চ লাইটের আবছা আলোয়

মাঝে মাঝে দেখা গেল নানা রকম জলজ উদ্ভিদ। বিচিত্র মাছ। বিচিত্র বর্ণের। আকার এবং আকৃতির। মাঝে ওদের মাঝে দেখা যেতে লাগল দু একটি আলোর ফুটকির মত কি যেন চলাফেরা করছে।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়েছিলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

সুমিত্রা বলল, কি দারুন সুন্দর, তাই না ডঃ রামচন্দ্রন?

ওরা এক ধরণের সামুদ্রিক মাছ ওরা নিজেদের দেহ থেকে আলো বিকীর্ণ করে। সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, ডঃ রামচন্দ্রন।

বলতে বাধা নেই, প্রকৃতির এই অদ্ভুত পরিবেশে সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়লেন।

অতিক্রান্ত হল আরও প্রায় পনের মিনিট।

আবার শোনা গেল কমোডোরের কণ্ঠস্বর।—জেণ্টলমেন, আমরা প্রায় চার মাইল দক্ষিণে সরে এসেছি। দয়া করে পর্যবেক্ষণের কাজ চালানর জন্যে আপনারা প্রস্তুত হন।

ফৌজী কণ্ঠস্বরে তাঁর এই আদেশ একটা কিছু সাংঘাতিকের মত মনে হল হয়ত। কিন্তু সবাই জানেন, আসলে একমাত্র সমুদ্রের জলের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া এখনকার মত কারোর কিছু করার নেই।

মোটামুটি যা, তা হল, ডঃ বাসু এবং ডঃ দত্ত এবার গিয়ে বসলেন ম্যাগনেটোমিটারের সামনে। উদ্দেশ্য, এ অঞ্চলের সমুদ্রের গভীরে কী ভাবে চৌম্বিক ক্ষেত্র ছড়িয়ে আছে সেটা জানা। এটা তাঁদের রুটিন কার্জ। আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশন থেকে বলে দেওয়া হয়েছিল, সমুদ্রের বুকে যে দুটি ঘূর্ণি দেখা দিয়েছিল, সমুদ্রের নিচের আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণের দরুণ যদি তারা হয়ে থাকে তাহলে ওই অঞ্চলের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে নিশ্চয় কিছু না কিছু অস্বাভাবিকতা ধরা পড়বে।

ডঃ দত্ত বললেন, আসুন, ডঃ বাসু। আমরা কাজ শুরু করতে পারি এখন।

ডঃ রামচন্দ্রনের আপাতত করার মত কিছু ছিল না। তিনি

জানালার পাশেই বসে রইলেন। অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের ওপর দায়িত্ব ছিল সমুদ্রের নিচেকার স্রোতের ওপর পর্যবেক্ষণ চালান। তিনি সুমিত্রাকে নিয়ে পাশের একটি ক্যাবিনে চলে গেলেন।

সুমিত্রা তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসল।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ কপট গাম্ভীর্য নিয়ে তাঁর দিকে চাইলেন।

মাফ করবেন, প্রফেসর। আমার ভুল হয়ে গেছে। বলল সুমিত্রা।

টু ব্যাড। আরও দু'টি দিন আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে, সুমিত্রা। এ সময়ে আমাদের চাল চলনে এতটুকু গোলমাল হলে সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাবে। অ্যান্টোনিয়েভিচ।

ভবিষ্যতে এমনটি হবে না। ক্ষমা প্রার্থীর কণ্ঠস্বর সুমিত্রার কণ্ঠে।

ধন্যবাদ। এবার ভাল করে দেখ দেখি কারোর নজরের মধ্যে আমরা পড়ি কি না? বলেই অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ ক্যাবিনের একেবারে কোণের দিককার একটি জানালার সামনে গিয়ে বসলেন।

সুমিত্রা চারপাশটা দেখে নিয়ে বললেন না। সবাই এখন ব্যস্ত। মনে হচ্ছে না, আমাদের এই ক্যাবিনের মধ্যে এক্ষুনি কেউ এসে পড়তে পারে।

ধন্যবাদ।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ এবার গায়ের কোটটি খুলে একটি হ্যাঙ্গারের সাহায্যে এমন ভাবে ঝুলিয়ে রাখলেন, যাতে কোটটি সব সময় পোর্ট হোলটিকে ঢেকে রাখে। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করলেন ছোট্ট একটি বস্তু। কতকটা ঘনকের মত দেখতে। বস্তুটি স্টেইনলেস স্টিলের তৈরী। মাঝখানে একটি তিন মিলিমিটার ব্যাসের লেন্স।

অধ্যাপক সুমিত্রাকে বললেন, আমার কোটটি একটু আলগা করে ধর দেখি। হ্যাঁ এই ভাবে, লক্ষ রেখ, আমার হাত দুটি যেন আড়ালে

থাকে। আর যে মুহূর্তে বুঝবে এই ক্যাবিনে কেউ আসছে, একটু শব্দ করো, আমি সাবধান হয়ে যাব।

সুমিত্রা কোটটি আলগা করে ধরল।

অধ্যাপক এবার সেই ঘনকটিকে জানালার কাঁচের গায়ে টেপ দিয়ে আটকে রাখলেন। আটকানর পর ঘনকটির ওপর মৃদু চাপ দিতেই একফালি মৃদু বেগুনী আলো তার লেন্সের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে বাইরে সমুদ্রের জলে গিয়ে পড়ল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে।

পরিস্কার দেখতে পেল সুমিত্রা, বেশ কিছুটা দূরে গভীর জলের মধ্যে হঠাৎ যেন একফালি উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল।

এক সেকেণ্ডের জন্যে হয়ত।

পরক্ষণেই আলোটি নিভে গেল।

তারপর অন্ধকার।

সুমিত্রা দেখল রুদ্ধশ্বাসে এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

তারপর কয়েক সেকেণ্ড।

অবশেষে—হ্যাঁ, খুব কাছেই মনে হচ্ছে না? মনে হল, মৃদু একটি বেগুনী আলো ডুবো জাহাজ থেকে হাত পঞ্চাশ দূরে থেকে ঠিক তার সমান গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যাপকের মুখে এবার ফুটে উঠল খুশির রেখা।

না, উজ্জ্বল সেই আলোর ঝলসানি শুধু যে সুমিত্রা এবং অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের চোখেই পড়ল তা নয়, ঝানু ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং থেকে শুরু করে কমোডোর এবং আর সব ক্রু'রও নজরে ধরা পড়ল।

কমোডোর ক্যাপ্টেন সিং-এর পাশে বসে ছিলেন।

হঠাৎ এমন এক ঝলক আলো দেখে চমকে উঠলেন তিনি।

আলোটা দেখলেন? ক্যাপ্টেনকে প্রশ্ন করলেন কমোডোর।

দেখেছি। গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন সিং।

আমি সেটা জানতে চাইছি না, আমার প্রশ্ন, এ থেকে আপনি বুঝলেন কিছু? কমোডোরের কণ্ঠে বিরক্তি।

আমি দুঃখিত কমোডোর, জলের নিচে এ ধরণের আলো জীবনে এই প্রথম দেখলাম।

আমিও।

বলেই পাইলট ক্যাবিন ছেড়ে তিনি ছুটে গেলেন বিজ্ঞানীদের কাছে।

ডঃ রামচন্দ্রনের সঙ্গে দেখা হল প্রথম। পোর্টহোলের মধ্যে দিয়ে কি যেন দেখছিলেন তিনি। হ্যালো ডক্টর, সিন দ্য ফ্ল্যাশ আউটসায়েড? ডঃ রামচন্দ্রনকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন কমোডোর। সুমিত্রাকে নিজের কোটটি পাহারা দিতে বলে ডঃ রামচন্দ্রনের ক্যাবিনে ততক্ষণ অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচও এসে হাজির হয়েছেন। সেই সঙ্গে ডঃ বাসু এবং ডঃ দত্তও। ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে ব্যস্ত থাকায় শেষের দুজনের চোখে অবশ্য আলোর ব্যাপারটা ধরা পড়ে নি।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, তিনিও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছেন।

আপনাদের কী মনে হচ্ছে, খুব নতুন ধরনের কিছু নয় কি? কমোডোরের কণ্ঠে উদ্বেগ। খানিকটা ব্যাখ্যা করার ভঙ্গীতে তিনি বললেন, আমাদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে, স্যারস। কেন এই অভিযান আমরা চালাচ্ছি সে কথা আগেই আপনাদের কাছে আমি ব্যাখ্যা করেছি। আমাদের খবর সমুদ্রের এই অঞ্চলে বিশেষ একটি তৎপরতা চলছে। এর পেছনে আসল হাতটি কার, আমরা জানি না। তবে আমরা চাই না, ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে কোন গোপন সামরিক কাণ্ডকারখানা গড়ে উঠুক।

কমোডোরের হঠাৎ এমন উক্তিতে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

কই, সামরিক কোন তৎপরতা গড়ে উঠতে পারে, এমন ইঙ্গিত

তো কমোডোর এর আগে দেন নি ?

বড় বেশি গম্ভীর দেখাল অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচকে। মনে হল, কমোডোরের শেষের কথাটি শুনে তাঁর মুখটি যেন শুকিয়ে গেছে। তাহলে, এখানে যে কিছু মানুষজন কাজ করছে এখবর কি কমোডোর রাখেন ? তবু যতদূর সম্ভব তাঁর চালচলন স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলেন তিনি।

শুনুন, স্যারস। বললেন কমোডোর।—তিন নম্বর দ্বীপের কাছে আজ ভোরে অজ্ঞাত এক বেতার সংকেত ধরা পড়ার পর, আপনাদের কি মনে হয় না, এই আলোর ঝলসানি আমাদের মগজের পক্ষে চিন্তা করার একটি বিষয় হতে পারে, আপনারা অজ্ঞাত বেতার সংকেত সম্পর্কে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন, যদিও সেটা আমার কাছে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এবার বলুন, এই আলোর ঝলসানি সম্পর্কে আপনারা কি বলতে চান ?

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের মুখ এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে।

খানিকটা শঙ্কিত হলেন তিনি। যত ব্যাখ্যাই যোগান যাক, ফৌজী অফিসার যে সব কিছু গুরুত্ব নিয়ে যাচাই করেছেন, কোন ঘটনাই হাল্কাভাবে দেখেন নি, এবার বোঝা গেল।

কিন্তু ব্যাপারটা সহজ করে দিলেন ডঃ রামচন্দ্রন। গোড়া থেকেই তাঁকে বেশ খানিকটা আত্মস্থ মনে হচ্ছিল। কমোডোরের কথায় এবার মুখ খুললেন তিনি।

বললেন, আমার তো মনে হচ্ছে এটা কোন জলজ প্রাণীর কাণ্ড। শুনেছি কোন কোন মাছের শরীর থেকে কখনও কখনও আলোর ঝলসানি বেরোয়। দূর থেকে হঠাৎ চোখে পড়লে দেখায় আলোর ফ্ল্যাশের মত। দক্ষিণ আমেরিকার কেপহর্নের কাছে এ ধরনের দু একটি মাছের আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম।

সে তো দক্ষিণ আমেরিকা। এখান থেকে তের হাজার মাইল দূরে। সেখানকার মাছ এত দূরে চলে এল ? আপনি দেখছি সেই

জাহাজটার ক্যাপ্টেনের মত কথা বলছেন, ডঃ রামচন্দ্রন। যিনি সমুদ্রের বুকে জলের ফোয়ারা দেখে অনুমান করেছিলেন, এ অঞ্চলে তিমি আনাগোনা করছে। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে কোন প্রাণীবিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত তিমির সাক্ষাৎ পান নি। আলোর ঝলসানির আপনার ব্যাখ্যাটা আমার কাছে ঠিক স্পষ্ট হচ্ছে না। বললেন কমোডোর।

হয়ত আরও কিছু বলতে চেয়েছিলেন তিনি।

আর সেই সময় ঘটল আর একটি অঘটন।

আমরা একটা গোলমালের মধ্যে পড়ে গেছি মনে হচ্ছে, কমোডোর। হঠাৎ ক্যাবিনের লাউডস্পিকার সরব হয়ে উঠল। কথা বললেন ক্যাপ্টেন সিং।

তার মানে? ক্যাপ্টেন সিং-এর কথায় চমকে উঠলেন কমোডোর।

আবার সেই ব্যাপার। ডুবো জাহাজের কম্পাস, ম্যাগনেটিক ডেফ্লেক্‌শন মিটার, এমন কি ম্যাগনেটোমিটার আবার সেই বেয়াড়াপনা শুরু করেছে, কমোডোর। বললেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং।

সে আবার কি?

কমোডোর ব্যানার্জি এবার সত্যিই যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

চলুন দেখি, কি ব্যাপার।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কমোডোর ব্যানার্জি, তার পেছনে ডঃ রামচন্দ্রন, ডঃ দত্ত, অধ্যাপক এবং ডঃ বাপ্পু।

এতক্ষণ ওই আলোর ব্যাপার নিয়ে সবাই পুরোপুরি নিবিষ্ট হয়ে থাকায় কারোর মনেই আসেনি এই দলটির মধ্যে একজন অনুপস্থিত। সে সুমিত্রা।

কিন্তু এবার সেটা নজরে পড়ল কমোডোরের।

ডঃ মালহোত্রাকে দেখছি না তো? প্রশ্ন করলেন তিনি।

ডঃ মালহোত্রা একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কমোডোর ব্যানার্জি। মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ।

অসুস্থ? তাঁর আবার কি হল? বলি মশায়, মেয়ে হচ্ছে মেয়ে। সব কাজ কি তাদের দিয়ে চলে? বুঝতে পারছি, শ্বাস কষ্ট কিছু হয়ত হবে। মাঝে ডুবো জাহাজের ভেতরের বাতাসের চাপ কিছুটা কমে গিয়েছিল। তা এ কথাটা এতক্ষণ বলেন নি? আর এদিকে আর এক ঝামেলা। ডঃ বাসু অনুগ্রহ করে আপনি বরং আপনার ছাত্রীটিকে সামলান। আমি যেতে পাচ্ছি না বলে দুঃখিত।

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন ডঃ বাসু। কমোডোর-এর কথায় তিনি সুমিত্রার ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালেন।

কথাটা বলেই ঝানু সেপাই-এর মত সবাইকে প্রায় বগলদাবা করেই পাইলট ক্যাবিনের দিকে যেন ছুটে গেলেন কমোডোর ব্যানার্জি।

গিয়ে দেখলেন, কম্পাসটার ওপর হুমড়ি খেয়ে দুজন অপারেটার কি যেন লক্ষ করছিল। ওঁরা যেতেই তাঁরা সরে দাঁড়াল।

আর তার পরক্ষণেই সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লেন কম্পাসের ওপর।

সে এক রুদ্ধশ্বাস মুহূর্ত।

অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয় ব্যাপার।

কম্পাসের ওপর দৃষ্টি পড়তেই মুহূর্তের জন্য সবাই পাথর হয়ে গেলেন।

আশ্চর্য, যে যন্ত্রটি গত তিন বছর একান্ত অনুগতের মত সমুদ্রের বুকে অথবা গভীরে এই ডুবো জাহাজটিকে পথের নিশানা জুগিয়ে এসেছে, এখন সে যেন পুরোপুরি অবাধ্য।

এ সব দেখে শুনে ক্ষোভে এবং হতাশায় কাঁপতে লাগলেন কমোডোর। একবার কম্পাসটির গায়ে চাপড় মারলেন।

কি সাংঘাতিক কাণ্ড।

কাঁটাটি হেলেদুলে ঘুরপাক খাওয়ার মত কেঁপে উঠে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। ভিন্ন দিক বরাবর। ঠিক যেন সেই দৈত্যের মত। বশ করা আংটিটি যতক্ষণ ছিল আঙ্গুলে, সে অনুগত ভৃত্য। কিন্তু আংটিটি

অপরের হাতে গেলেই সে আমার কেউ না।

তার মানে এবার থেকে কোন দিকে যাচ্ছি, আমরা তা আর বুঝতে পারব না। গম্ভীর কণ্ঠে কথা বললেন কমোডোর ব্যানার্জি।

শুধু কম্পাসই নয়, সমুদ্রের গভীরতা মাপার চৌম্বক যন্ত্রটিও ঠিক সমান তালে পাগলামী শুরু করে দিয়েছে। যেমনটি দিয়েছিল তিন নম্বর দ্বীপে।

• কমোডোর বললেন, জাহাজের প্রপেলার বন্ধ করে দিন ক্যাপ্টেন সিং। ব্যাপারটা আমরা ভাল করে বুঝে নিই।

প্রপেলার আমি বন্ধ করেই রেখেছি। ক্যাপ্টেন সিং জানালেন।

বলতে কি, সবারই মুখ শুকিয়ে গেছে মনে হল।

ওঁরা পরিষ্কার দেখলেন কম্পাসের কাঁটা আর যথারীতি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বলতে যে দিক বোঝায় সে দিকে আর মুখ করে নেই। বরং মাঝে মাঝে এদিক সেদিক সরে যাচ্ছে। যার অর্থ, এ কম্পাসের সাহায্যে দিক নির্ণয় করা আর সম্ভব নয়।

গভীরতা মাপার যন্ত্রটি চালানর চেষ্টা করলেন এবার ডঃ দত্ত স্বয়ং। কিন্তু এ যন্ত্রটির পাগলামি দেখে তাঁর নিজের মাথাই বিগড়ে যাওয়ার মত অবস্থা দাঁড়াল। পর পর রিডিং নিলেন তিনি। জাহাজটি একই জায়গায় প্রায় দাঁড়িয়ে। অথচ সেখানকার গভীরতা মাপতে গিয়ে দেখা গেল, কোনবার সেই গভীরতা একশ' ফুট। কখনও বা মনে হচ্ছে পাঁচ ফুট। যেন এই বুঝি জলের নিচের ভূস্তরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

ডঃ রামচন্দ্রন শান্ত প্রকৃতির মানুষ। এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন তিনি। কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রটির হাল দেখে তিনিও ভয় পেলেন।

আমি বুঝতে পাচ্ছি, সমুদ্রের নিচে এবার আমরা কবরস্থ হব। বললেন তিনি।

কমোডোর তাঁর দিকে করুন দৃষ্টিতে চাইলেন।

তাঁর মুখের প্রতিটি পেশী স্থির অচঞ্চল। বোঝা গেল তিনি মনে মনে কোন সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছেন।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, এক কাজ করলে কেমন হয়, কমোডোর। অবস্থা যা দেখছি, জলের মধ্যে দিয়ে চলাটা এখন আর নিরাপদ নয়। বরং জাহাজটি জলের ওপর ভাসিয়ে নিলে কেমন হয়?

জানি। তবে সেটা আমাদের শেষ চেষ্টা। কমোডোর যেন অন্যমানুষ হয়ে গেছেন এতক্ষণে। তিনি নিজেও যে ভয় পেয়েছেন বোঝা শক্ত হল না।

তবু যতদূর সম্ভব নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, শুনুন মশাই। এতক্ষণ আমাদের জাহাজে কোন ত্রুটি দেখা দেয় নি। এখন হুট করে আমাদের যন্ত্রপাতি বেয়াড়াপনা শুরু করেছে। আপনারা কি মনে করেন, এসব শুধু শুধুই ঘটছে? নিশ্চয় বাইরের কারোর হাত আছে। আপনারা বিজ্ঞানী হয়েই ব্যাপারটা ধরতে পারছেন না যখন, আমি আর কি বলব, বলুন? সারা ভারত মহাসাগরের ওপর-নিচ গত পাঁচ বছরে চষে বেড়িয়েছি। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা এই প্রথম হল।

আশ্চর্য! বললেন ডঃ দত্ত।—অনেক সময় সমুদ্রের নীচে চুম্বকের পাহাড় থাকলেও সব যন্ত্রপাতি খানিকটা পাগলামী করে। কিন্তু যতদূর জানি, তেমন কোন পাহাড় তো এ তল্লাটে থাকার কথা নয়।

সেজন্যেই তো বলছি, মশাই।

কমোডোর মন মেজাজ খারাপ থাকলে 'মশাই' কথাটাই ব্যবহার করেন বেশি।

ঠিক এই মুহূর্তে ডুবো জাহাজটিকে আমার কোন মতেই জলের ওপর ভাসাতে পারি না। বলা তো যায় না কেউ হয়ত ওঁৎ পেতে সেখানে বসেই আছে? কমোডোর।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ

পুঁছলেন কয়েকবার। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যেত আসলে এটা তাঁর মুখের উপর ফুটে ওঠা মনের ভাবটি গোপন করারই একটা প্রচ্ছন্ন কায়দা। কারণ, কমোডোর ব্যানার্জির মাথায় শত্রু ছাড়া কিছু ঢুকছে না। কিন্তু তিনি তো জানেন আসল ব্যাপারটা কি?

এ যেন এক নিশ্চল মুহূর্ত।

গভীর সমুদ্রের গহ্বরে পৃথিবীব কয়েকজন মানুষ পুরোপুরি তখন পাথরের মত নিষ্প্রাণ।

কমোডোর ভাবছেন, তাহলে তিনি কি পরাজিত সৈনিক?

ডঃ দত্ত, যিনি জীবনের দীর্ঘ সময় এ তল্লাটের সমুদ্র চষে বেড়িয়েছেন ঠিক এই মুহূর্তে মনে হল, তিনি নিতান্ত এক শিশু ছাড়া আর কিছু নন।

ডঃ রামচন্দ্রন সম্পূর্ণ নির্বাক।

আর অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচের রুমাল দিয়ে মুখ মোছা যেন আর শেষ হতে চায় না।

প্রায় তিন মিনিট।

তারপর প্রথম কথা বললেন কমোডোর ব্যানার্জি নিজেই।

বললেন, দয়া করে আপনার যন্ত্রপাতি আর একবার পরীক্ষা করে দেখুন, ডঃ দত্ত।

তাঁর কথা মত ডঃ দত্ত ম্যাগনেটোমিটারের দিকে এগিয়ে গেলেন। পেছনে আর সবাই।

ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটি এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।

কমোডোর জিজ্ঞেস করলেন তাঁকে, গোলমাল কিছু মিটল?

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়ে জানালেন, মেটে নি।

ডঃ দত্ত দেখলেন, সব কিছুই তখনও বিকল। কম্পাসের কাঁটা একপাশে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাগনেটিক ডেফথ্ মিটার আগের মতই অকর্মণ্য।

• হঠাৎ কি খেয়াল হল ডঃ দত্তের। তিনি ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে আবার রিডিং নিতে শুরু করলেন।

এক একবার রিডিং নেন, পরক্ষণেই সেই সব রিডিং কমপ্যুটারের প্যানেলের কাছে পৌঁছে দেন। এ কাজে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটি তাঁকে সাহায্য করতে লাগলেন।

এইভাবে আরও পাঁচ মিনিটের মত সময় কেটে গেল।

ডঃ দত্ত বললেন, অনুগ্রহ করে রেজাল্টগুলি আমাকে দিন তো।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক একটি করে কাগজ এগিয়ে দিলেন।

কাগজগুলোর ওপর পর পর কয়েকটি করে সংখ্যা ছাপা। আর মাঝখানে আঁকাবাঁকা দাগ। যেন অদ্ভুত সব রেখাচিত্র। দেখে মনে হয়, একজন শিল্পী সরু একটি পেন্সিল বুলিয়ে দাগ টেনে গেছে। কোন কোন দাগ এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছে। কোনটি বৃত্তের মত, আবার কোনটি ডিম্বাকৃতির। তবে কোন দাগই অপর কোন দাগকে ছেদ করে যায়নি।

আশ্চর্য! কাগজগুলির ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে মন্তব্য করলেন ডঃ দত্ত।

মানে? কমোডোর প্রশ্ন করলেন।

আমাদের জাহাজটা এখন যেখানে দাঁড়িয়ে তার আশপাশের চৌম্বক ক্ষেত্রগুলি কেমন অদ্ভুত আকার নিয়েছে, দেখুন। বললেন ডঃ দত্ত।

কমোডোর কাগজগুলির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। যদিও ওসব হিজিবিজি দাগের কোন কিছুই তাঁর মাথায় ঢুকল না।

ডঃ রামচন্দ্রনও কাগজগুলি পরীক্ষা করলেন। এবং বিস্মিত হলেন।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ কাগজগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন কয়েকবার।

কমোডোর তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, আপনি যেন বেশি ঘামতে শুরু করেছেন প্রফেসর? ভয় পেয়েছেন নাকি? ঘাবড়াবেন না,

টরপেডো দিয়ে ফুটো করে দেখা হয়েছে, এমন ডুবো জাহাজেও আমাকে কাটাতে হয়েছে। তবু এখনও বেঁচে রয়েছি। মাথা ঠাণ্ডা রেখে না চললে বিপদকে ডেকে আনার কাজটা আরও সহজতর হয়। বলে, কতকটা ভরসা দেবার ভঙ্গীতে অধ্যাপকের কাঁধে হাত রেখে একটু চাপ দিলেন তিনি।

অধ্যাপক তাঁর কথায় মৃদু হাসলেন, ভাবটা, যেন সত্যিই কত ভরসাই না পেলেন তিনি। আর মুখে বললেন, না না আমি ঠিক আছি কমোডোর।

ধন্যবাদ।

আশ্চর্য। এই না হলে ফৌজী অফিসার? মাথার ওপর শমন এলেও রীতি-নীতিগুলি তাঁদের মধ্যে থেকে লোপ পায় না।

আর অধ্যাপক মনে মনে ভাবলেন, যাক, সন্দেহ করার মত এখনও তেমন কিছু তিনি করেন নি।

ডঃ দত্ত বললেন, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, একটা ভৌতিক চৌম্বক-ক্ষেত্র আমাদের ডুবো জাহাজটি পুরোপুরি ঘিরে রেখেছে। আর এর জন্যেই চৌম্বক যন্ত্রগুলি ঠিকমত কাজ করতে পারছে না। ঘূর্ণি ঝড়ের মাঝে মাঝে যেমন নিম্ন চাপের গহ্বর থাকে, বায়ুচাপমান যন্ত্র যার মধ্যে রাখলে চাপ নির্দেশকারী কাঁটা অনবরত নামা-ওঠা করে, এ ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা কতকটা হয়েছে সেই রকম। তবে বায়ু চাপমান-যন্ত্রের বেলায় নয়, হয়েছে কম্পাসের বেলায়। আমাদের জাহাজটি এখন চৌম্বক ক্ষেত্রের গহ্বরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। যেখানে চৌম্বকক্ষেত্র বলতে স্বাভাবিক অর্থে যা বোঝায়, যা জাহাজ চালনায় সাহায্য করে, তার কিছুই নেই।

হয়ত আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ডঃ দত্ত।

কিন্তু মাঝ পথে কমোডোর বাধা দিলেন।

আপনার তত্ত্ব কথা এখন রাখুন তো, ডঃ দত্ত। বলুন, কম্পাস কি তাহলে কাজ করবে না? কমোডোরের প্রশ্ন।

এ অবস্থায় আমার উত্তর, না। কতকটা আত্মমগ্নভাবে উত্তর দিলেন ডঃ দত্ত।

তাহলে আপাততঃ আমাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। পাশ থেকে মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং।

তার মানে ? কমোডোর ক্যাপ্টেনের কথায় যেন চমকে উঠলেন।

মানে পরিষ্কার, কমোডোর ব্যানার্জি। ডুবো জাহাজের প্রপেলার আমরা থামিয়ে দিয়েছি বটে, কিন্তু সমুদ্রের নিজস্ব স্রোতে একটু একটু করে আমরা ভেসে চলেছি। জায়গাটা খারাপ। কাছাকাছি একটা পাহাড়ে রাজ্য আছে। ডুবো পাহাড়। তা ছাড়া একটি ঠাণ্ডা জল-স্রোত। যার কথা আগেই বলেছিলাম। যাকে বাঁচিয়ে চলতে গিয়েই এতদূর আসতে হয়েছে আমাদের। এভাবে ভেসে চলতে চলতে যদি একবার তার মধ্যে গিয়ে পড়ি, সেই স্রোতের তোড়ে যে কোথায় আমরা ভেসে যাব, কেউ জানি না। এ স্রোত সরাসরি দক্ষিণ মেরুর দিকে চলে গেছে একেবারে মহাসাগরের প্রায় পাঁচশ' ফুট গভীর জলের নিচে দিয়ে।

উঃ! এ কথাটা তো আমার মাথায় আসেনি ? ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর কথার ফাঁকে খানিকটা যেন উল্লসিত হয়ে বাধা দিলেন ডঃ দত্ত। বলেন, তা যদি হয়, যদি সত্যিই আমাদের জাহাজ ভেসে চলে, আমরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারি। হয়ত এমনও হতে পারে, যেখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে সেখানকার মাটির গভীরে শক্তিশালী একটি ভূ-চুম্বক থাকতে পারে। যা এর আগে কোন অনুসন্ধানকারীর চোখে পড়ে নি বলেই তার খবর আমরা রাখি না। সেই ভূ-চুম্বকের ফলেই স্থানিকভাবে এখানে একটি বিশেষ ধরণের চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্যেই আমাদের সমস্ত চৌম্বক যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করতে পাচ্ছে না। স্রোতের টানে কিছুটা দূরে সরে গেলে এই ক্ষেত্রটির প্রভাব থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি।

কিন্তু ডঃ দত্তকে আর শেষ করতে দিলেন না কমোডোর।

যেন বাজ পড়ল।

আপনি থামুন, ডঃ দত্ত। আপনারা যাঁরা তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামান, বড় একপেশে চিন্তা করেন। সত্যিই যেন বাজ পড়ার মতই শোনাল কমোডোর ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর। বললেন, আপনি বলছেন এখানে একটি এক চাঁই বড় চুম্বক মাটির নিচে পোঁতা রয়েছে বলে এমনটি হচ্ছে। তাই যদি হয়, তিন নম্বর দ্বীপের কাছের ঘটনাটি তা হলে কি, মশায়? কম্পাস বা আর সব যন্ত্রপাতির বিগড়ে যাওয়াটা তো এই প্রথম নয়। সেখানেও তো হয়েছিল। কাঁধে ভূত চাপলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি ঘটনাই তাদের ভাগ্যে ঘটেছিল সেখানেও। আবার আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। আপনি কি বলবেন, সেখানেও একটা আস্ত ভূ-চুম্বক কিছুক্ষণের জন্যে কেউ মাটির নিচে পুঁতে রেখেছিল?

অকাট্য যুক্তি।

ডঃ দত্তের মুখে সত্যি যেন আর ভাষা নেই।

একসকিউজ মি, ডঃ দত্ত! হঠাৎ মাথা গরম করার জন্যে আমি ক্ষমা চাইছি।

অদ্ভুত চরিত্র কমোডোর ব্যানার্জির। এই না হলে সেনা বিভাগের বড় কর্তা হওয়া যায়? নিজের ত্রুটির জন্যে পরক্ষণেই তিনি ডঃ দত্তের হাত জড়িয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

না, না, তাতে কি? আমার ভুলই হয়েছিল। বললেন ডঃ দত্ত।

জানি, এ ভুল আমারও হোত। মৃত্যুকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে কেউ মাথা ঠিক রাখতে পারে না ডঃ দত্ত। আমরা ফৌজী মানুষ। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। যাক, আপাতত আপনার কথাই থাক। আপনি, ডঃ রামচন্দ্রন এবং প্রফেসর যন্ত্রপাতির ওপর একটু নজর রাখুন। ক্যাপ্টেন সিং আর আমি পাইলট ক্যাবিনে গিয়ে লক্ষ্য করি জাহাজটি কোন দিকে ভেসে চলেছে। আসুন, ক্যাপ্টেন। বলেই কমোডোর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে পাইলট ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালেন।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ এতক্ষণ কমোডোরকে লক্ষ্য করছিলেন। মনে মনে হাসলেন তিনি। কারণ তিনি জানেন, আসলে ক্যাপ্টেনকে নিয়ে কমোডোর আড়ালে একটু শলাপরামর্শ করতে চান বলেই ওই ভাবে চলে গেলেন।

ডঃ দত্ত বললেন, আসুন, যন্ত্রপাতি দেখা যাক আর একবার।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, আপনারা দেখুন। আমি মিনিট পাঁচ একটু সুমিত্রাকে দেখে আসি।

এতক্ষণ এ কথাটা কারোর মনেই ছিল না।

চলুন, আমরাও ওঁকে একটু—ডঃ রামচন্দ্রন কথা বলার চেষ্টা করলেন।

অধ্যাপক বললেন, তেমন কিছুই না। আমিই সামলাচ্ছি এখন ওদিকটা।

তিনি সুমিত্রার ক্যাবিনের দিকে পা বাড়ালেন।

শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা দাঁড়াল এই রকম।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ দেখলেন সব কিছুই নিয়ম মাফিক এগিয়ে চলেছে।

পোর্টহোলের ওপর ঝুলছে তাঁর সেই বিচিত্র কোট। তার পাশে দুটি আসন। একটিতে বসে সুমিত্রা। ভাবটা এমন, যেন বড় বেশি ক্লান্ত সে। তার পাশের আসনে ডঃ বাসু। সুমিত্রার একটি হাত তাঁর কোলের ওপর।

আসুন প্রফেসর। অধ্যাপককে ক্যাবিনে ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডঃ বাসু।

খুব ভাল। অভিনয়টা জমে উঠেছে বেশ। সত্যি তোমরা ভাল অভিনেতা, ডঃ বাসু, সুমিত্রা। ভাগ্য ভাল, এখনও পর্যন্ত কেউ কোন সন্দেহ করতে পারেন নি, বললে অধ্যাপক।

এদিকেও সব ঠিকমত চলছে, স্যার। সুমিত্রা আসন ছেড়ে উঠে অধ্যাপককে জানাল।

খুব ভাল। তাহলে চারটে আলোই এসে হাজির হয়েছে? অধ্যাপকের প্রশ্ন।

হ্যাঁ। চারটেই রুটিন মত এসে হাজির হয়েছে। দুটি এ পাশে। আর দুটি জাহাজটির ওপাশে। বললেন ডঃ বাসু।

ডঃ বাসুর কথায় অধ্যাপক পোর্টহোলের দিকে এগিয়ে গেলেন। চারপাশটা দেখে নিলেন একবার। তারপর আস্তে আস্তে কোর্টটি একপাশে সরিয়ে পোর্ট হোলের বাইরে গভীর সমুদ্রের দিকে তাকালেন।

এই তো। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। পিচ কালো অন্ধকারের মধ্যে, মিটার পনের দূরে দুটি ফিকে বেগুনী আলোর বিন্দু। জাহাজটা সেখানে ভাসছে, সেখান থেকে প্রায় আট মিটার গভীরে। দুটি আলোর মধ্যে ব্যবধান প্রায় পঞ্চাশ মিটার।

মৃদু হাসলেন অধ্যাপক।

সুমিত্রা বলল, এ যেন ভাবা যায় না, অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

জানি। তবু নিজের চোখেই তো দেখছ সব।

ডঃ দত্ত বললেন, আমরা কিন্তু দারুণ ঝুকি কাঁধে করে চলেছি, প্রফেসর। আমাদের জাহাজটি ভেসে চলেছে। যদি এ ভাবে ওই প্রাণঘাতী দক্ষিণ স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ে, আপনি বুঝতে পারছেন, আমরা কোথায় গুঁড়িয়ে যাব?

তাও জানি। হিম শীতল সেই স্রোত ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে দক্ষিণ মেরুর দিকে ছুটে চলেছে সমুদ্রের গভীরে। তার মধ্যে পড়লে আমরা কেউ বাঁচব না। তবে সে আশঙ্কা আর নেই। আমি ভেবেছিলাম তিন দিন এইভাবে আমাদের কাটাতে হবে। কিন্তু যে পরীক্ষাটির জন্যে এটা করার ছিল, দেখতেই তো পেলে, সেটা অভাবিত ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। অতএব, তিন দিন না কাটলেও

চলবে। আমরা ঘণ্টা ছয় অপেক্ষা করব। এটা নিরাপত্তার জন্যে দরকার। তার আগে কয়েকটি কথা জেনে নিই।

ডঃ বাসু এবং সুমিত্রা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অধ্যাপকের দিকে চাইলেন।

সুমিত্রা, তুমিই বল। কারণ আসল কাজের দায়িত্বটি তোমার ওপর দিয়েই আমি পাশের ক্যাবিনে চলে গিয়েছিলাম।

বলুন, কি বলতে হবে? সুমিত্রা জিজ্ঞেস করল।

যে ঘনকটিকে পোর্টফোলের এক পাশে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তার উপরকার এক নম্বর বোতামটি তুমি কখন টিপেছিলে?

উজ্জ্বল সেই আলোর ঝলসানি দেখার পাঁচ মিনিট পর।

বোতাম টেপার পর কি দেখলে?

বহুদূরে মনে হল একটি বেগুনী আলো। প্রথমে অবশ্য একটি। পরে একে একে আরও তিনটি আলো দেখতে পেলাম। আলোগুলো পাশাপাশি এগিয়ে এল। আমি আরও দশ মিনিট অপেক্ষা করে দু নম্বর বোতামটি টিপে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ওদের মধ্যকার দুটি আলো দু পাশ থেকে সরে গিয়ে এখন যেখানটায় তাদের দেখছি সেখানে দাঁড়িয়ে গেল।

বাকি দুটি আলো কি করল?

ওরা সোজাসুজি জাহাজটির দিকে এগিয়ে এল। হ্যাঁ কাছে। একেবারে কাছে। পরে জাহাজের নিচ দিয়ে ওপাশটায় চলে গেল। কিন্তু কি বলব, স্যার। একটিকে দেখেছি আমি। অসতর্ক বশতঃ ওই সময় আপনার কোটটা পোর্টহোল থেকে একটু বেশি সরে যায়। ফলে ক্যাবিনের ভেতরকার উজ্জ্বল আলো গিয়ে পড়ে সমুদ্রের জলে। সেই আলোয়, কি বলব, প্রফেসর, একটা দানব না জন্তু—কি ভয়ঙ্কর চেহারা।

ডলফিন। মৃদু কণ্ঠে কথা বললেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

ডলফিন? মানে, আপনি ডলফিন মাছের কথা বলছেন, অধ্যাপক?

ঠিক তাই। যাক, এ নিয়ে এখন কোন কথা নয়। পরে সমস্তই জানতে পারবে তোমরা। বলেই ডঃ দত্তের ক্যাবিনে চলে এলেন তিনি।

ওদিকে একের পর এক ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে চারপাশের চৌম্বক ক্ষেত্রের ছবি তুলে চলেছেন ডঃ দত্ত। মিনিটের পর মিনিট।

দেখতে দেখতে প্রায় এক ঘণ্টা এগিয়ে গেল।

কিন্তু মাথা যেন তার গুলিয়ে যাবার মত অবস্থা।

টেলিফোনে যোগাযোগ করলেন তিনি পাইলট ক্যাবিনের সঙ্গে।

ওপাশ থেকে ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং-এর: ইয়েস, ক্যাপ্টেন স্পিকিং?

ক্যাপ্টেন সিং আপনার কি মনে হয়, এই এক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজটি এক পা'ও নড়ে নি? প্রশ্ন করলেন ডঃ দত্ত।

কি বলছেন আপনি, ডঃ দত্ত? আমরা ভেসে চলেছি। কোন দিকে জানি না। তার এই এক ঘণ্টায় কম করেও আমরা মাইল তিন আগের জায়গা থেকে দূরে সরে এসেছি। বললেন ক্যাপ্টেন সিং।

মাইল তিন—? ডঃ দত্তের কণ্ঠে বিস্ময়।

কেন? মনে হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে খুব অবাক হয়ে গেলেন, ডঃ দত্ত?

আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না, ক্যাপ্টেন। রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডঃ দত্ত।

ডঃ রামচন্দ্রন বললেন, কি হোল?

ডঃ দত্ত কমপ্যুটার থেকে এক প্রস্থ কাগজ টেনে ডঃ রামচন্দ্রন এবং অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ কতখানি কি দেখলেন বোঝা গেল না। ডঃ রামচন্দ্রন কাগজটির ওপর চোখ বুলিয়ে নিরাসক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, এ তো সেই একই ছবি। এক ঘণ্টা ধরে এমন ছবি অনেক

তো দেখলাম। আর কত দেখব ?

সে কথা আমি বলছি না ডক্টর। একমাত্র আপনি শুনলেন আমাদের জাহাজ প্রায় তিন মাইল দূরে সরে এসেছে। অথচ দেখুন, এতদূর আমরা সরে এলাম কিন্তু চৌম্বক বল রেখার ছবির মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। যেন মনে হচ্ছে, বিশেষ ধরণের একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের ঝুলির মধ্যে কে যেন আমাদের পুরো জাহাজটি পুরে রেখেছে। আর জাহাজটি যেখানে যাচ্ছে, ঝুলিটিও সঙ্গে চলেছে।

ডঃ দত্তের শেষের কথায় ডঃ রামচন্দ্রন যেন চমকে উঠলেন।

তাই তো ? এ কথা তো আমার মনে পড়ে নি ? বললেন তিনি।

সত্যিই আশ্চর্য। এক এক জায়গার চৌম্বক ক্ষেত্র এক এক রকম। অথচ—। একেবারে চুপ করে থাকলে খারাপ দেখায় বলেই যেন কিছু বলার চেষ্টা করলেন অধ্যাপক।

গোড়া থেকেই মস্ত বড় একটা ভুল করে যাচ্ছি আমরা। এতক্ষণ নিষ্কর্মার মত এভাবে বসে না থেকে আমাদের উচিৎ ছিল সমুদ্রের এ অঞ্চলটির ওপর অনুসন্ধান চালান। বিড় বিড় করে কথা বললেন ডঃ দত্ত।

আর পরমুহূর্তেই সেখানে এসে হাজির হলেন কমোডোর ব্যানার্জি এবং ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিং।

আপনি যেন কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন, ডঃ দত্ত ? প্রথম কথা বললেন ক্যাপ্টেন স্বয়ং।

ডঃ দত্ত বললেন, আমি লক্ষ্য করছি, জাহাজটা স্থান পরিবর্তন করলেও, চৌম্বক ক্ষেত্রের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না। কমোডোর আমার মনে হয়, এ অঞ্চলটির ওপর আমাদের অনুসন্ধান চালান উচিৎ।

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন ডঃ দত্ত।

ঠিক কথা। কি করতে হবে, বলুন ? কমোডোর ডঃ দত্তের কথায় সায় দিলেন।

জাহাজটি যথা সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে আরও খানিকটা গভীরে নামিয়ে—মানে মাটির কাছাকাছি গিয়ে দেখা যাক এ তল্লাটের ভূ-স্তরের মধ্যে কোন কিছু আভাস পাওয়া যায় কিনা।

বেশ তাই করুন। আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন সিং এতে আপত্তি করবেন না? বললেন কমোডোর।

না, আপত্তির আর কি আছে? আমি বরং নিজেই জাহাজটি নিচের দিকে নামানর দায়িত্ব নিচ্ছি। ক্রু-দের বলে দিচ্ছি সেই সঙ্গে চারপাশটায় সার্চ লাইট ফেলে আলোকিত করতে।

ধন্যবাদ, ক্যাপ্টেন। আপনি তাই করুন। কমোডোর।

ক্যাপ্টেন সিং আর অপেক্ষা না করে পাইলট ক্যাবিনে চলে গেলেন।

আমি বরং ডঃ বাসু এবং সুমিত্রাকেও ডেকে আনি। বললেন অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ।

সুমিত্রার নাম শুনতেই খানিকটা সচেতন হয়ে উঠলেন কমোডোর। কিছুটা লজ্জিতও হয়ত।

কেমন আছেন ডঃ মালহোত্রা? অন্যায় হয়ে গেছে আমার। তিনি অসুস্থ। অথচ এতক্ষণ একবার তাঁর খোঁজও নিলাম না। খানিকটা কৈফিয়তের সুরে কথা বললেন কমোডোর।

না, না। এখন তিনি ভাল। এখুনি ওদের আমি ডেকে আনছি। আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। বললেন অধ্যাপক।

আসলে অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ চাইছিলেনও না, কমোডোর আবার তাঁর সঙ্গে আসুন। কারণ শেষ দায়িত্বটি পালন করার কাজ তখনও বাকি ছিল।

অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ চটপট কাজ সারলেন এরপর।

সুমিত্রাদের ক্যাবিনে এসে প্রথমেই নিজের কোটটি গায়ে চড়িয়ে দিলেন তিনি। তারপর পোর্টহোলের পাশে বসান সেই ঘনকটির

ওপরকার তিন নম্বর বোতামটি টিপে দিলেন।

ডঃ বাসু, সুমিত্রা এবং অধ্যাপক-এর দৃষ্টি বাইরের দিকে নিবদ্ধ রইল।

ওঁরা দেখলেন, বোতাম টেপার সঙ্গে সঙ্গে ঘনকটির পাশের সেই লেনসটির ওপর জ্বলে উঠলে ছোট একটি হলুদ আলোর বিন্দু। জ্বলার পর দূরের সেই বেগুনী আলো দুটি পাশাপাশি সরে এল। সেই সঙ্গে ডুবো জাহাজের নিচ দিয়ে ওই দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল আরও দুটি বেগুনী বিন্দু। এগিয়ে গিয়ে তারা সারিবদ্ধ হল।

আর পর মুহূর্তে ঘটতে লাগল একের পর এক নাটকীয় ঘটনা।

অদূরে সেই বেগুনী আলো সারিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশে দিনের মত পরিষ্কার করে তুলল ডজন খানিক সার্চ লাইট। ডঃ দত্তের অনুরোধে ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিংই আলোগুলি জ্বালিয়ে দিলেন।

কমোডোর ব্যানার্জি তখন একটি পোর্টহোলের ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে। আলো জ্বলার পর তাঁর মনে হল প্রায় পঞ্চাশ মিটার দূরে—না, ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না তিনি, স্বপ্ন দেখছেন না, জেগে রয়েছেন।

চিৎকার করে ডাকলেন তিনি, ডঃ বাসু, ডঃ দত্ত, ডঃ রামচন্দ্রন—আসুন দেখি এদিকে।

তাঁর ডাকে পোর্টহোলের দিকে ছুটে গেলেন সবাই।

দেখুন, দেখুন—ওই তো—! আঙ্গুল দিয়ে দূরে সেই দিকে দেখতে বললেন সবাইকে।

মুহূর্তের জন্যে শ্মশানের নীরবতা।

অমন পাথর হয়ে গেলেন কেন? আপনারা কিছু বলুন? কমোডোর এবার চেঁচিয়ে উঠলেন।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত লক্ষ করার পর প্রথম কথা বললেন

ডঃ রামচন্দ্রন : মাছের মত মনে হচ্ছে। কিন্তু অমন কিম্ভূত চেহারা কেন? দেখুন, দেখুন মাথার ওপর বেগুনী রঙের আলো মনে হচ্ছে না?—আরে—এই যা! আলোগুলি নিভে গেল।

ব্যাপারটা পাইলট ক্যাবিন থেকে ক্যাপ্টেন মহীন্দর সিংও লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন কমোডোরের কাছে।

দেখেছেন? মনে হল এর বেশি কিছু বলার মত ক্ষমতা ক্যাপ্টেন যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

কিন্তু ততক্ষণ প্রথম ধাক্কার রেশটি কাটিয়ে উঠেছেন কমোডোর ব্যানার্জি।

এবার শক্ত মিলিটারি অফিসারেরই মত তিনি আদেশ দিলেন, ক্যাপ্টেন সিং, ভাগ্যে যাই থাক। ওদের ধাওয়া করুন। দরকার হলে টরপেডো দাগতেও পিছুপা হবেন না।

আরে? কম্পাস তো ঠিক হয়ে গেছে। কমোডোরের কথা শেষ হতে না হতেই পেছন থেকে শোনা গেল সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটির কণ্ঠস্বর।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সবাই ছুটে গেলে চৌম্বক যন্ত্রপাতির দিকে।

হ্যাঁ। সব আগের মতই সচল।

ডঃ দত্ত দেখলেন, শুধু কম্পাস নয়, ডেফথ্ মিটার, ম্যাগনোটো মিটার, সবাই যেন এখন একান্ত অনুগত।

আশ্চর্য! ভৌতিক কাণ্ডই বলতে হবে। ম্যাজিকের মত মনে হচ্ছে না? ডঃ দত্ত যেন দিশেহারা হয়ে উঠলেন।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি ওখানে বসে কাজ করুন তো? আসুন ক্যাপ্টেন।

কমোডোর দ্রুত চলে গেলেন লেভিগেশন ক্যাবিনে।

ডুবো জাহাজটা দুলে উঠল। তারপর প্রচণ্ড ঝাকুনি দিয়ে ছুটে চলল সেই রহস্য জনক বস্তুগুলির দিকে।

যাত্রীরা সবাই প্রতি মুহূর্তে এক অজ্ঞাত আশঙ্কা মাথায় নিয়ে

মুহূর্ত গুণতে লাগলেন।

অতিক্রান্ত হল প্রায় এক ঘণ্টা।

না, যাদের পেছনে ধাওয়া করা শেষ পর্যন্ত কিন্তু তারা অদৃশ্য হয়ে গেল।

তা হোক! কমোডোর বললেন, অনেকটা সময় আমরা নষ্ট করেছি। এবার প্ল্যান মত এগোন যাক।

ক্যাপটেন মহীন্দর সিং তাঁর নির্দেশ মত যেখানে ঘূর্ণি দেখা গিয়েছিল ঠিক সেই দিক বরাবর এগিয়ে যেতে লাগলেন।

সবাই নিশ্চুপ।

অতিক্রান্ত হল আরও দুই ঘণ্টা।

তারপর ক্যাবিনের মধ্যে শোনা গেল লাউড স্পিকারে কমোডোর ব্যানার্জির কণ্ঠস্বর ঃ ডঃ দত্ত, দেখুন তো, যেখানটায় আপনি খাল আছে বলেছিলেন, আমরা কি ঠিক সে জায়গাটায় হাজির হই নি?

চমকে উঠলেন ডঃ দত্ত।

আরে? হ্যাঁ, তাইতো? কিন্তু—? দাঁড়ান, দাঁড়ান আমাকে একটু ভাল করে দেখতে দিন কমোডোর। আচ্ছা, ডুবো জাহাজটিকে একটু মাটির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যায় না? বললেন ডঃ দত্ত।

নিশ্চয় যাবে। বলেই পাইলটকে জাহাজটিকে মাটির কাছাকাছি নিয়ে যেতে বললেন।

ডুবো জাহাজ নিচে নামল। নেমে মাটির প্রায় বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু পাঁচ মিনিটও দেরি হল না সব কিছু বুঝে নিতে। সাবমেরিনের সার্চ লাইটে সেখানকার ভূ-স্তর পরীক্ষা করে বললেন ডঃ দত্ত—কমোডোর, আমি যা ভেবেছিলাম, তাই ঠিক। আশপাশের ভূ-স্তর ভেঙ্গে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গড়িয়ে পড়ে গর্তগুলি বুঁজে গিয়েছে।

সবাই কৌতূহলী হয়ে জায়গাটা দেখতে লাগলেন।

কমোডোর বিস্ময়ে নির্বাক।

ডঃ দত্ত বললেন ডঃ বাসু আপনি ভাল করে দেখুন তো। পাথরগুলির ওপর দিয়ে ডুবো জাহাজের আলো যে ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তা দেখে কি মনে হচ্ছে—অতি সম্প্রতি তাদের টুকরো করা হয়েছে? তা না হলে ওদের গায়ে শ্যাওলা জমে থাকত। আলো অত জোরে প্রতিফলিত হতে পারত না।

তাই তো মনে হচ্ছে, ডঃ দত্ত।

এর অর্থ, বুঝলেন কমোডোর ব্যানার্জি—অতি সম্প্রতি এখানকার ভূস্তরে প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্প ঘটেছে। সেই ভূকম্পনে এখানকার আশপাশের খুদে খুদে পাহাড় ভেঙে টুকরো হয়ে ওই সব নালার মধ্যে পড়েই তাদের বুঁজে দেয়। আমার ধারণা, ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে হতভাগ্য লোকগুলি এবং তাদের লঞ্চ ওই গর্তগুলির মধ্যে তলিয়ে যাওয়ার পর তাদের কাঁধের ওপর পাথরের স্তূপ নিয়ে পড়ে এবং তারা কবরস্থ হয়।

আরে, আরে? ওই তো, একটা মাস্তুল মনে হচ্ছে না? হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন ডঃ রামচন্দ্রন।

কথাটা ঠিক। সত্যিই সেটা একটা মাস্তুলের ডগা।

তার মানে, আপনার কথাই ঠিক ডঃ দত্ত। সেই লঞ্চগুলি এখানেই কবরস্থ হয়েছে।

অথচ সেদিন এর কাছ বরাবরই তো আমি ঘুরে গেছি, চোখে পড়ল না? গম্ভীর শোনাল কমোডোরের কণ্ঠস্বর। সম্ভবত পর্যবেক্ষণের এই ত্রুটির জন্যে নিজেকেই শাসন করলেন তিনি।

বেশি দেরি হল না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই দূরে একটি ফিকে লাল আলো দেখা গেল। আশেপাশে অনুচ্চ পাহাড়।

জাহাজটি আরো এগিয়ে গেল। আলো উজ্বল হল। সেই সঙ্গে যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের দুটি চোখও।

—দাঁড়ান। বলেই ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ তাঁর ব্রিফকেস থেকে একটি ছোট টর্চ বের করে ফোকাস ফেলতে লাগলেন।

সবাই দেখলেন, হঠাৎ অদূরের সেই আলোটি নিভে গেল। পর মুহূর্তেই জ্বলে উঠল হলুদ, পরে সবুজ আলোর ঠিকানা।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, মিনিট দশেক অপেক্ষা করুন। ওঁরা আমাদের খবর পেয়েছেন।

অদ্ভুত হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে না? ডুবো জাহাজ থেকে চারিপাশে উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়েছে। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে— চারপাশে অজস্র বৈদ্যুতিক কেবল—বড় বড় চোঙ। ব্যাপার যে কি, কেউই বুঝতে পারছেন না।

কমোডোর এবং ভদ্রমহোদয়গণ, এবং ভদ্রমহিলা—সুমিত্রার দিকে চেয়ে একটু মৃদু হেসে কথা বললেন ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ্—মিনিট দশ পনেরোর মধ্যে একজন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। তাঁর সময়ের প্রচণ্ড দাম। মিনিট পনেরর বেশি এখানে তিনি থাকবেন না। ওই যে দূরে লাল আলোর সংকেতটি আপনারা দেখছেন—তারই সাহায্যে একথা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন।

হ্যাঁ ঠিক দশ মিনিট পর ছোট্ট একটি সাবমেরিন এসে ভিড়ল কমোডোরের সাবমেরিনটির পাশে। তার ভেতর থেকে মুখোশে ঢাকা দুটি লোক এসে কমোডোরের সাবমেরিনের মধ্যে ঢুকলেন।

ডঃ নিগুচি! সমর মুখার্জি!

এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। ডঃ বাসু এবার রীতিমত বিস্মিত।

ডঃ নিগুচি এগিয়ে এসে প্রথমে কমোডোরের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ডঃ বাসু পরিচয় করিয়ে দিলেন—কমোডোর ব্যানার্জি। তার পর কমোডোরকে বললেন, আমি এঁকেই সন্দেহ করেছিলাম, কমোডোর। তারপর, বাবা সমর, তুমি কাজের ছেলে বুঝতে পাচ্ছি। সমর মুখার্জির দিকে চেয়ে সপ্রশংস হাসি হাসলেন তিনি।

পরে ডঃ বাসু একে একে সকলের সঙ্গে ডঃ নিগুচিকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমি দুঃখিত। আমার হাতে সময় কম। একটি জরুরী গবেষণার কাজ চলছে। ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কাছ থেকে আগেই খবর পেয়েছিলাম আপনারা আসছেন। চলুন, আমার মুলুকটা আপানাদের দেখিয়ে দিই। না, না, আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে ভয়ের কোন কারণ নেই, কমোডোর। দয়া করে আমার ডুবো জাহাজটিতে উঠুন। কারণ সেখানে যেতে গেলে এ জাহাজটি ছাড়া আপাতত আর কোন পথ নেই।

ডঃ নিগুচির আমন্ত্রণে সবাই তাঁর ডুবো জাহাজে গিয়ে উঠলেন।

আর তার পাঁচ মিনিট পরই এমন একটি পরিবেশে উপস্থিত হলেন, চোখে না দেখলে যেন বিশ্বাস করা যায় না।

আসুন! দয়া করে আপনারা নিজের চোখে দেখুন। এ সব করতে আমার তিন বছর সময় লেগেছে।

অবিশ্বাস্য!

সবাই দেখলেন, তাঁরা যেন আকাশ ছোঁয়া একটি ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে। ঘর? বরং বলা চলে একটি স্বতন্ত্র পৃথিবী। একটি গুহা জগৎ! লম্বায় প্রায় সিকি মাইল। চওড়াও ততটা। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় সমস্ত কিছু দিনের মত পরিষ্কার। ছোট ছোট বাগানে টমেটো, কপি, সাক সব্জির গাছ। ছোট কয়েকটি পুকুরে নানা রকমের মাছ। শত শত রঙ বেরঙ আলোর বাল্ব জ্বলছে, নিবছে। তাদের আলো গাছের ওপরে অথবা পুকুরের জলে। মাঝে মাঝে বিরাট এক একটি জালার মত—হিস হিস শব্দ হচ্ছে তাদের মধ্য থেকে। প্রায় শ খানিক লোক নানা রকম যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে। গোটা পাঁচেক পাওয়ার হাউস।

সব কিছুই যেন অদ্ভুত। আগন্তুকদের কাছে মনে হল তাঁরা হলিউডের তৈরি রোমাঞ্চকর ফিল্ম দেখছেন।

রুদ্ধশ্বাস ! সবাই পুতুলের মত নির্বাক।

এ সবের উত্তরাধিকারী হবেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা। কথা বললেন, ডঃ নিগুচি। মাফ করবেন, আধঘণ্টার বেশি এখানে আপনাদের থাকা উচিত হবে না। আসুন এর মধ্যেই সংক্ষেপে ব্যাপারটা আপনাদের বুঝিয়ে দিই। আমাদের ক্ষেত খামারে দেখতেই পাচ্ছেন নানা রকম ফল, শাক সব্জীর গাছ। দুটি উপায়ে এদের আমরা ফলিয়ে তুলছি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম জীব জন্তুর মৃত দেহ জমে রয়েছে সমুদ্রের গভীরে। তাদের সংগ্রহ করে আমরা সার হিসেবে কাজে লাগাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন, ফলনটা কেমন হয়েছে। দুই, গাছের জন্যে চাই সূর্যের আলো। এটা না হলে গাছ সালোক সংশ্লেষণ চালাতে পারে না। অথচ এই গুহার মধ্যে সূর্যের আলো পাবেন কোথায় ? তার জন্যেই কাজে লাগান হয়েছে বাম্বের আলো। সূর্যের যে যে বিকিরণ উদ্ভিদ জগৎকে সালোক সংশ্লেষণে সাহায্য করে, ওই সব বাল্ব থেকে সেই বিকিরণ নিয়ন্ত্রিত করে খুব কম সময়ে গাছের ফলন আমরা বাড়াতে পেরেছি। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে গাছ ফল দিতে সময় নেয় তিন বছর, সে গাছে আমাদের এখানে ফল ধরছে তিন মাসে। যে শাকসব্জী পুরুষ্ট হতে সময় নেয় তিন মাস, এখানে সময় নিচ্ছে মাত্র পনের দিন।—আর ওই যে বড় বড় জালা। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে ওই জালার মধ্যে জল থেকে আমরা অকসিজেন তৈরি করছি। গাছের জন্য চাই কার্বনডাই-অক্সাইড। বাতাসে যাতে উপযুক্ত পরিমাণে এই গ্যাসটি থাকে তারও আমরা ব্যবস্থা করেছি। চূণাপাথর গরম করে তৈরি করা হচ্ছে এই গ্যাস। এই গ্যাস সালোক সংশ্লেষণের ব্যাপারে গাছকে সাহায্য করছে। ····বড় বড় পুকুরে মাছ লালন পালন করা হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন, এখানে খাবারের ভাবনা নেই।

কিন্তু এত বিদ্যুৎ শক্তি কোথায় পাচ্ছেন, বলুন তো ? ডঃ রামচন্দ্রনের প্রশ্ন।

খুবই সহজ ব্যাপার। আপনারা জানেন পৃথিবীর গভীরে রয়েছে অফুরন্ত তাপ। আমরা পাশাপাশি দুটি করে লোহার নল পুঁতে দিয়েছি প্রায় সাত হাজার ফুট গভীর পর্যন্ত। ওই নলের একটির মধ্যে দিয়ে পাঠান হচ্ছে জল। সেই জল পৃথিবীর গভীরে গিয়ে তাপের স্পর্শে গরম হয়ে বাষ্পে পরিণত হয়ে আর একটি নল দিয়ে উপরে উঠে আসছে। সেই বাষ্প দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটার চালান হচ্ছে। এবং তা থেকে আমরা পাচ্ছি অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তি। এর জন্যে একটা পয়সাও আমাদের খরচা করতে হচ্ছে না।

কিন্তু মশায়, আমরা আছি কোথায়, বলুন দেখি? কমোডোরের প্রশ্ন।

ডুবন্ত একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে। এ রকম চারটে গুহা এরই মধ্যে আমরা তৈরি করে ফেলেছি। বললেন ডঃ নিগুচি।

কিন্তু এত বড় সব পাহাড়ে এত বড় বড় গুহা তৈরি করলেন কী করে? ডঃ দত্তের প্রশ্ন।

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ বাধা দিয়ে বললেন, এখন না। এর উত্তর পরে আমিই আপনাদের দেব ডঃ দত্ত। তার আগে, হ্যাঁ, ডঃ নিগুচি, আপনার সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের ফলে বেশ কয়েকজন নাবিক জলে ডুবে মারা গেছে বলে আমরা আশঙ্কা করছি—নিশ্চয় সে খবর আপনি রাখেন?

ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচের কথায় ডঃ নিগুচির মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, এর জন্যে আমি দুঃখিত। তবে তাঁরা সবাই ক্রমে সুস্থ হয়ে আসছেন। আমরা জানতাম, এমনটি ঘটবে। ওই সময় তাঁরা যে আমাদের ঘূর্ণির মধ্যে এসে পড়বেন, আমরা ভাবতেই পারি নি। আমরা ওঁদের লঞ্চগুলি রক্ষা করতে পারিনি। তবে ওঁদের রক্ষা করেছি। আমাদের হাসপাতালে রয়েছেন ওঁরা এখন। আশা করছি দিন পনেরর মধ্যে ওঁদের আমরা বাড়ি পাঠাতে পারব।

বেঁচে আছে? যেন একটা স্বস্তির শ্বাস ফেললেন কমোডোর।

কিন্তু বিস্ফোরণ? এর মানে কি? ডঃ দত্তের প্রশ্ন।

সে জবাবও আমি পরে আপনাদের দেব, ডঃ দত্ত। ডঃ নিগুচির

হাতে সময় কম। ওঁকে আর বেশি প্রশ্ন করা যাবে না। তারপর কমোডোর ব্যানার্জির দিকে চেয়ে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, স্যার আশাকরি সব বুঝাত পারছেন। দয়া করে আপনার ওপরওলাদের জানাবেন, যা কিছু এখানে ঘটছে, তাতে আপনার দেশের নিরাপত্তার কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। বরং ভবিষ্যৎ পৃথিবীর মানুষ এতে যথেষ্ট উপকৃতই হবেন।

তাই তো মনে হচ্ছে এখন। সংক্ষেপে জবাব দিলেন কমোডোর।

• ডঃ নিগুচি সবাইকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সেনাবাহিনীর ডুবো জাহাজ পর্যন্ত। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ ওঁরা বেনানগায় ফিরে এলেন।

এবং সেদিন রাতেই ছোট্ট একটি বৈঠকে মূল ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেবার জন্যে ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ বিজ্ঞানীদের সামনে ছোট্ট একটি বক্তৃতাও দিলেন।

ড. অ্যান্টোনিয়েভিচ বললেন, ডঃ নিগুচি যা করছেন তার সার কথা পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে। সেই পরিমাণে খাদ্যের জোগান কমছে। ওঁর ধারণা বাঁচার তাগিদে মানুষকে একদিন পৃথিবীর স্থলভাগ ছেড়ে সমুদ্রের গভীরে আশ্রয় নিতে হবে। সেটা যে সম্ভব, সে তো আপনারা নিজের চোখেই দেখে এলেন। এ ব্যাপারে ডঃ নিগুচিকে সাহায্য করছেন পৃথিবীর বেশ কয়েকটি শক্তিশালী দেশ। কমোডোর হয়ত বলবেন, এসব কাজ তাহলে গোপনে করা কেন? এর উত্তর এ ধরণের কাজে বাধা অনেক। বিশেষ করে রাজনৈতিক বাধা। আপনারা তো জানেন, রাজনীতিবিদরা সহজ ব্যাপারকে শুধু জটিলই করতে জানেন, তাতে স্থায়ী শান্তি বিঘ্নিত হয়। কাল্পনিক যুক্তি তর্কের জাল সৃষ্টি করে তাঁরা যাতে এত বড় সম্ভাবনাপূর্ণ গবেষণায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না করতে পারেন, তার জন্যেই এই গোপনীয়তা। ডঃ নিগুচির শেষবারের বিস্ফোরণের পর ভারত সরকার পর্যবেক্ষক দল পাঠানর ব্যবস্থা করলেন। বিস্ফোরণ বললে ভুল হবে, বরং বলি সেই ঘূর্ণিই এর জন্যে দায়ী। সেই ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে যদি ক্যাপ্টেন হিহং-এর

জাহাজ তলিয়ে না পড়ত অথবা অতগুলি মাঝি মাল্লা লোপাট না হোত তা হলে এ খবর ভারত সরকারের কানে গিয়ে পৌঁছতো না। জুরিখে শুনলাম, ভারতের সেনাবিভাগ অনুসন্ধানের কাজে নেমেছে। আমি প্রমাদ গুনলাম। পাছে ভুল বোঝাবুঝি হয়—তাই নিজেই চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে।

কিন্তু বিস্ফোরণটা? ডঃ দত্তের প্রশ্ন।

হ্যাঁ, বিস্ফোরণ। ডঃ নিগুচি এ ব্যাপারে অদ্ভুত একটা মতলব মাথা দিয়ে বের করেছেন। ডঃ বাসু আপনি তো জানেন, এর আগে গত তিন বছরে পৃথিবীর কয়েকটি দেশ ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে?

জানি। ডঃ বাসুর উত্তর।

এ কথাও জানেন, ওই সব বিস্ফারণের দরুণ পৃথিবীতে যে ভূ-কম্পন ঘটেছিল—সেই ভূকম্পনের কয়েকটি ঘটনা নিয়ে বেশ একটা চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল?

জানি। কারণ, চারটে ঘটনায় এমনটি ঘটে। এবারটা নিয়ে পাঁচটি ঘটনা ঘটল।

ঠিক তাই। এবারকারটা নিয়ে পাঁচটি ঘটনা। ব্যাপার এই, মোট পাঁচটি বিস্ফোরণের সময় ডঃ নিগুচিও একটি করে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন।

কি রকম? ডঃ দত্তের প্রশ্ন।

খুবই সহজ। সমর মুখার্জির ওপর দায়িত্ব ছিল, পৃথিবীতে কখন কোথায় কোথায় ভূগর্ভে পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটান হবে সে খবরটি ডঃ নিগুচিকে বলে দেয়া। ছোকরা জুরিখে আমার কাছেই ছিল। আমার দপ্তর থেকেই খবরগুলি সংগ্রহ করে সে ডঃ নিগুচিকে জানাত। অবশ্য শেষের ঘটনাটির সময় একথা আমি জানতে পারি। প্রথমে রাগ হয়েছিল ওর ওপর। পরে বিস্মিত হয়েছি। —হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ডঃ নিগুচি গ্রেট চ্যানেলের এক একক পাহাড়কে নিজের গবেষণার জন্যে বেছে গর্ত করে তাদের গভীরে রেখে দেন একাধিক পরমাণু

বোমা। তারপর যখনই কোন রুটিন টেস্ট করা হোত—সেই সঙ্গে তিনিও তাঁর বোমাগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটাতেন। এমনভাবে ঘটাতেন যাতে করে যখনই কোন দেশের বোমা ফাটত ওই একই সময়ে তাঁরও বোমাগুলি ফাটত। বুঝতে পারছেন ডঃ বাসু। এর জন্যই শেষ বারে অস্ট্রেলিয়ায় যখন পঞ্চাশ কিলোটনের বোমা ফাটান হয়—তখন তার দরুণ সৃষ্ট ভূমিকম্পন অত বেশি মাত্রায় আপনার যন্ত্রে ধরা পড়ে। ইনটারন্যাশন্যাল পরমাণু কমিশন জানাল পঞ্চাশ কিলোটনের বোমা ফেটেছে। অথচ আপনাদের এবং অনেকের যন্ত্রেই ধরা পড়ল 'পাঁচশ' কিলোটনের কম্পন। উদ্দেশ্য, পৃথিবীর চোখে ধুলো দেওয়া। সবাই ভাববে কম্পনটা বুঝি অস্ট্রেলিয়ার বোমাতেই হয়েছে। —কৃতিত্ব আছে বলতে হবে ডঃ নিগুচির, এমনভাবে তিনি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন—যার ফলে ওই সব পাহাড়ের মধ্যে বড় বড় গুহা তৈরি হয়ে গেছে, কিন্তু পরিবেশে তাদের বিকিরণ ছড়িয়ে পড়তে পারে নি।

তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই। ডঃ নিগুচির বিস্ফোরণের দরুণ আশপাশের ভূ-ত্বক ভেঙ্গে গিয়েই সমুদ্রের নিচের গর্তগুলি ভরাট করে দিয়েছে, তাই নয় কি, ডঃ অ্যান্টোনিয়েভিচ ?

ঠিক। আপনি ঠিকই ধরেছেন, ডঃ দত্ত।

কিন্তু ঘূর্ণি—? ডঃ রামচন্দ্রনের প্রশ্ন।

এটাও সহজ। পাহাড় গর্ত করার পর তাদের গুহার মধ্যে বিকিরণ তো থাকবে ? তাই গর্ত করার পর তাদের গুহার মধ্যে জল ঢোকান হয়। তোড়ে জল ঢোকার সময় সমুদ্রের বুকে ওই ঘূর্ণি হয়েছিল।

দুটি ঘূর্ণি কেন ?

কারণ ডঃ নিগুচি দুটি করে পাহাড়ে গর্ত করেছিলেন। দুটি গর্তে জল ঢোকার সময় দুটি ঘূর্ণি তৈরি হয়। পরে এই জল পাম্প করে বের করে দেওয়া হবে। তাহলে ওই সব গর্তের মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণের দরুণ যে সব তেজষ্ক্রিয় কণা তারাও গর্ত থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন গুহার মধ্যে বাস করলে কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু, তেজস্ক্রিয় কণার ধোয়ানি সমুদ্রের জল তো কলুষিত করবে? তাতে মাছের ক্ষতি হতে পারে।

জানি। অবশ্য এক বছরের আগে ডঃ নিগুচি ধোলায়ের কাজটি করবেন না। এই সময়ে জমে থাকা তেজস্ক্রিয় কণার তেজস্ক্রিয়তা অনেকটা কমে যাবে। অবশ্য কিছুটা থাকবেও। তাতে জলজ প্রাণীর যৎসামান্য যে ক্ষতি হবে, বলাই বাহুল্য। তবে বৃহত্তর মানব কল্যাণের জন্যে এটুকু ক্ষতি আমাদের স্বীকার করতেই হবে, ডঃ দত্ত।

দীর্ঘ বক্তৃতার পর নিশ্চুপ হলেন ডঃ এণ্টোনিয়েভিচ।

কিন্তু আরও একটি প্রশ্ন না জিজ্ঞেস করে পারছি না, অধ্যাপক অ্যাণ্টোনিয়েভিচ।

বলুন। অধ্যাপকের মুখে সৌম্য হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

একটা ব্যাপার আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমাদের ডুবো জাহাজে ছু ছু'বার ওই ভাবে সমস্ত চৌম্বক যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে গিয়েছিল কি ভাবে?

এবার অধ্যাপকের কণ্ঠে ভেসে উঠল মার্জনা ভিক্ষার সুর।

তিনি একে একে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে শুরু করে ডঃ বাসুকে যা যা বলেছিলেন, একে একে বলে গেলেন। বেনানগায় মধ্যাহ্ন ভোজের পর কিভাবে ডঃ নিগুচির সঙ্গে বেতার মার্ফৎ কথা বলেন, তাঁর কোটের রহস্য, সমস্ত। বললেন, তিন নম্বর দ্বীপ থেকে প্রথম অনুসন্ধানের সময় সমুদ্রের ওপর ভেসে থাকা ফেনা দেখে আপনারা মনে করেছিলেন জঞ্জাল। আসলে ওই এক একটি ফেনা ডঃ নিগুচির তৈরী বিশেষ ধরণের এরিয়াল। আমার পাঠান বেতার সংকেত ওই এরিয়ালের মাধ্যমেই ডঃ নিগুচি ধরে নিচ্ছিলেন। অত্যন্ত শক্তিশালী এর ক্ষমতা। এমন ভাবে তৈরি, দেখলেনই তো, আপনাদের স্পর্শ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন তারা নষ্ট হয়ে গেল। বাইরের মানুষ যাতে কোনভাবে অনুসন্ধান না চালাতে পারে, তার জন্যেই এই অবস্থা।

তা না হয় হলো। কিন্তু ডুবো জাহাজের চৌম্বক যন্ত্রপাতি ওই

ভাবে বিকল হয়ে যাওয়া—

আসলে ডঃ নিগুচির এটাই ছিল বড় রকমের একটি গবেষণার বিষয়। নিজের নিরাপত্তার জন্যেই যা তিনি করতে চেয়েছেন।

কি রকম? কমোডোর এবার কৌতুহলী হয়ে উঠলেন।

ডুবোজাহাজ চালনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্যে অদ্ভুত একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন, ডঃ নিগুচির দল। অধ্যাপক অ্যান্টোনিয়েভিচ বলে যেতে লাগলেন।—এর জন্যে তিনি ডলফিনদের কাজে লাগাচ্ছেন। এক একটি ডলফিনের মাথায় বাঁধা থাকে আলোর সংকেত। তার পিঠ এবং পেটের সঙ্গে বেঁধে দেয়া হয় প্রচণ্ড শক্তিশালী চুম্বক! এত শক্তিশালী চুম্বক এবং এত স্বল্প আয়তনের পৃথিবীতে কেউ আজ পর্যন্ত তৈরী করতে পারে নি। ডলফিনগুলির মস্তিষ্ক কোষের মধ্যে জীব রাসায়নিক পদ্ধতিতে 'স্মৃতি' প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সে আবার কি? কমোডোরের প্রশ্ন।

কত গতিতে এবং কিভাবে কোথায় তারা যাতায়াত করবে—এই যে স্মৃতি, এই স্মৃতি তাদের মস্তিষ্ক কোষের মধ্যে পুরে দিয়েছেন ডঃ নিগুচি। বিশেষ বিশেষ বর্ণের আলোর সংকেত পেলেই কিভাবে, কি কাজ করতে হবে ওরা তা বুঝতে পারে। আমার অপরাধ আমি স্বীকার করছি, কমোডোর। বৃহত্তর কল্যাণে, আপনার সঙ্গে কিছুটা চালাকি আমাকে করতে হয়েছে। ডঃ নিগুচির সব কথা একমাত্র ডঃ বাসু এবং সুমিত্রাকেই আমি বলেছিলাম। ডুবো জাহাজে সুমিত্রা অসুস্থ হয়েছে, এটাও আমি মিথ্যে প্রচার করেছিলাম। আসলে, এই যে ছোট্ট ঘনকটা দেখছেন—এটা চালু রাখার দায়িত্ব ছিল তার ওপর।

ঘনকটিকে খুঁটিয়ে দেখলেন সবাই।

অধ্যাপক বলে চললেন, গভীর সমুদ্রে হঠাৎ আলোর ঝলসানি আর কিছুই নয়, সংকেত।

ডলফিনগুলিকে ডঃ নিগুচি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন জাহাজের কাছ বরাবর। তাদের পিঠের ওপরকার উজ্জ্বল আলো জ্বেলে আমাকে

জানান হয়, তারা এসে গেছে। তারপর এই ঘনক থেকে বিশেষ বিশেষ বর্ণের সংকেত পাঠাই তাদের উদ্দেশ্যে। ওই আলোর সংকেত দেখে চারটি ডলফিনের দুটি এসে দাঁড়িয়েছিল জাহাজের একপাশে, আর দুটি জাহাজের অন্য পাশে। এই ঘনকের সংকেত অনুসারে তারা পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে এমনভাবে ডুবো জাহাজের পাশে চলতে থাকে, যার ফলে তাদের বুক এবং পিঠে বাঁধা শক্তিশালী চুম্বক পুরো জাহাজটিকে ঘিরে রাখে। যেন একটি চুম্বকের থলের মধ্যে জাহাজটিকে পুরে রাখা হলো। এর ফলে, পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র ওই পরিবেশে অকেজো হয়ে যায়। কম্পাসের কাঁটা হয় স্তব্ধ। ডেফথ মিটার কাজ করতে পারেনি।

ম্যাগনেটোমিটারে যা ধরা পড়েছে তা ওই কৃত্রিম চৌম্বক ক্ষেত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

তিন নম্বর দ্বীপের কাছেও ঠিক এই পদ্ধতিতে ডুবো জাহাজের চৌম্বক যন্ত্রপাতি বিকল করে দেওয়া হয়েছিল। এক্ষেত্রে, মূল ঘাঁটি থেকে দূর বলে, ওদের মনিটার করার জন্যে আমাকে আলোর সংকেত কাজে লাগাতে হয়েছে। আশা করি আমার এই স্বীকারোক্তির জন্যে ক্ষমা করবেন, কমোডোর।

অধ্যাপকের কথা শুনে মৃদু হাসলেন কমোডোর ব্যানার্জী। বললেন, এটা এখন নিরর্থক প্রফেসর। তবে হ্যাঁ, যদি তখন এই কারচুপিটা ধরা পড়লে আপনাকে আমি অবশ্যই কোর্ট মার্শাল করতাম। সাংঘাতিক লোক, মশায়। আপনি একেবারে সাপ হাতে নিয়ে খেলেছেন।

কমোডোরের কথায় সবার মুখে নেমে এল এক অনাবিল স্বস্তির চিহ্ন।

ডঃ বাগ্চির মনে পড়ল ডঃ নিশুচির সেই শান্ত অথচ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক মুখের ছবি। সে মুখের ওপর একটিই অভিব্যক্তি: যা করছি আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্যেই করছি।

———